প্রবাসী

সম্পাদক মণ্ডলী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দে, ডি-এস-সি, ইঞ্জিনিয়ারিং (গ্লাসগো) এম-আই-ই, এ-এ-ই
কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ কর্ম্মচারী ও পূর্ত্ত-সচিব

শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট্, এম-টি-এস
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, (ক্যান্টাব্)
প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এস-সি, এম-টি-এস,
ভারতগভর্ণমেণ্টের শুল্ক বিভাগের রসায়নবিৎ

পরিচালক

শ্রীযুক্ত সুশীল কৃষ্ণ রায় চৌধুরী, এম-আই-এম-এ, এম-টি-এস

প্রতি সংখ্যা ।৵ আনা।

কার্য্যালয়—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

+ সূচী +

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১	মায়ের ডাক	(কবিতা)	১
২।	ভারতের বিজ্ঞানোন্নয়নের বিশিষ্টতা	(প্রবন্ধ) অধ্যাপক জিতেন্দ্র নাথ সেন	
৩।	পথের ধারা	(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়	৫
৪।	বিজ্ঞানের ভাষা	(আলোচনা)	৮
৫।	পরীক্ষা	(কবিতা) অধ্যাপক হেমন্ত কুমার সেন	১১
৬।	অজৈব রসায়ন	(বিজ্ঞান) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়	১৩
	সেবাপথে পূর্ত্ত শিল্প	(প্রবন্ধ) ডক্টর যে	২২
৮।	ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান	(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত সুনীল কৃষ্ণ রায় চৌধুরী	২৩
৯।	মানের নীতি	অধ্যাপক হেমন্ত কুমার সেন	২৬
১০।	দেব দর্শন	(কবিতা) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী	২৯
১১।	বর্ষ বিভাট	(গল্প) শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মুন্সী	৩১
১২	স্থপতি বিজ্ঞানে ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	(ইতিহাস) শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল	৩৮
১৩	কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্র নাথ	(জীবনী) শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসি চরণ চক্র	৪২
১৪।	তাপ	(বিজ্ঞান) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়	৪৭
১৫।	কুতব্ মিনার	(ইতিহাস) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী	৬০
১৬।	সম্পাদকীয়		
১৭।	পুস্তক পরিচয়		৬৬
১৮।	পত্রালাপ		৬৮
১৯।	পূর্ত্ত-বিজ্ঞান পরিষৎ		৭২

"পথ"এর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি ঃ—

১। "পথ"এর বার্ষিক মূল্য ৬৲, সডাক ৬৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ৭৲, প্রতি সংখ্যা ৷৷০

২। মাঘ মাস হইতে নব বর্ষ আরম্ভ হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

	বাৎসরিক
পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২২৲
সিকি পৃষ্ঠা	

অকেজো দ্রব্য প্রসার কল্পে নিম্নলিখিত **বিশেষ** হার নির্দ্দিষ্ট হইল।

	এক সংখ্যা	মাসিক	বাৎসরিক
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲		২০০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা		৩০৲	১১২৲
সিকি পৃষ্ঠা		৩২৲	৯০৲
আধুলি পৃষ্ঠা		২৷৷ ৩০৲	৩৷৷

"পথ"এর প্রকাশের জন্য নূতন বিজ্ঞাপন ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে, পুরাতন বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ১২ই তারিখের মধ্যে জানান চাই।

প্রবন্ধ লেখকগণের প্রতি ঃ—

"পথ"এ প্রবন্ধ প্রকাশ করার ভার সম্পাদক মণ্ডলীর উপর। সঙ্গে ডাক টিকিট দেওয়া না হইলে অমনোনীত কোন প্রবন্ধ ফেরত বা উত্তর দেওয়া হয় না।

পরিচালক "পথ"
২৮এ, রাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীট
শ্যামবাজার, কলিকাতা

ফোন—কলিকাতা ১১২৮

চক্ষু রত্নং মহাধনং।

চক্ষু অমূল্য রত্ন। চক্ষু অনেক মহাজন হইতে সকলেরই সময় সময় চশমা ব্যবহার করিতে হয়। কোকেন, চক্ষু-পরীক্ষা ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা চশমা ব্যবহার করিতে হয়। আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি সুলভে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া থাকেন। চশমা ভাঙ্গিলে মেরামত করিতে হয়, আমাদের দোকানে আসিয়া কাটালগ দেখিয়া বাজারের দরের সহিত তুলনা করিলেই সুবিধা ও পরিচয় পাইবেন।

নিউ ইণ্ডিয়ান্ অপ্‌টিক্যাল কোঃ

৮৭।৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্

রত্ন—কণা

এত ভাষায় কেবল মাত্র উপদেশ সংগ্রহ পূর্ণ পুস্তক এই সর্ব্বপ্রথম হইল। ইহাতে গৃহীর কর্ত্তব্য, ভাবীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য, স্বামীর কর্ত্তব্য, সকলের কর্ত্তব্য, পিতার কর্ত্তব্য সমস্তই সন্নিবেশিত আছে প্রত্যেককে উপহার দিবার একপ পুস্তক আর নাই।

প্রাপ্তিস্থান :—**ন্যাশ্ব-ব্রাদার্স**

১৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

কাজল-কালী

রাজন লালী ব্যবহার করে সাধুবাদ দান করেছি। এত লালিমা বিদেশী লালীর কোন কালে সম্ভব নয়। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেমিক্যাল এক্সচেঞ্জ কোম্পানি

৭৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,কলিকাতা

চন্দ্র এণ্ড ঘোষ কোং

১৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্

IRON FOUNDERS

AND

MERCHANTS

ইমারত উপযোগী যে কোন লৌহ, বাগানের লোহার বেলিং, গেট, এবং ঢালাই লৌহের মাবতীয় থাম, গোল সিঁড়ি, বেলিং এবং কড়ি, বরগা কম্পোজিট প্রভৃতি সত্বর ও সুবিধায় পাইবেন।

আমাদের বিশেষত্ব গোল সিঁড়ির কাজে।

অর্ডার প্রাপ্তেই আমরা সরবরাহ করিতে পারি।

পূর্ব্ব জগতে যুগান্তর !

ছাদে ও দেওয়ালে লাগাইবার জন্য "এস্‌বেস্‌টস্‌ প্লেস্তারা", সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় উপাদানে, ভারতীয় অর্থে ও ভারতীয় শ্রমিক দ্বারা প্রস্তুত।

"এ, পি, সি, কোট"

দেওয়ালে লাগাইবার জন্য এস্‌বেস্‌টস্‌ হইতে প্রস্তুত প্লেস্তারা, ইহা ঘরের ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে লাগাইলে আর কখনও "লোণা" লাগিবে না, যে দেওয়ালে লোণা লাগিয়াছে তাহার উপর লাগাইলেও লোণার চিহ্ন থাকিবে না—এবং লোণা একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, দেখিতে অতি সুন্দর—শ্বেত প্রস্তরের মত হইবে, ইচ্ছা মত রং করাও চলিবে।

"এ, পি, সি, ষ্টোণ"

ছাদে লাগাইবার জন্য এস্‌বেস্‌টস্‌ হইতে প্রস্তুত প্লেস্তারা, ইহার ব্যবহারে ছাদের জলপড়া বন্ধ হইবে এবং গ্রীষ্মকালে ছাদের উত্তাপ ঘরের ভিতর একেবারে আসিবে না।

ছাদ যে রকম ফাটা হউক না কেন ইহার ব্যবহারে একেবারে নূতন অপেক্ষা মজবুত হইবে এবং কালো ও দেখিতে প্রস্তরের মত হইবে, অথচ ফাটিবে না।

উপরিউক্ত দুই প্রকার প্লেস্তারা ব্যবহারে অল্পখরচে বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্য ঘরের ভিতর অনুভূত হইবে না, কারণ ইহা এস্‌বেস্‌টস্‌ হইতে প্রস্তুত।

এই প্লেস্তারা যে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য :—

সরকারী সাধারণ কার্য্য বিভাগ (P.W.D), বিলাতী হোটেল, চটকল, রেলওয়ে, সরকারী এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনীয়ারের বাটী, ও কলিকাতার পাদ্রী (Lord Bishop's palace) বিশেষ উল্লেখ যোগ্য,—

অনুসন্ধান করুন :—টেলিফোন নং ২৭৯৭ কলিকাতা

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা—"Hornblende" Calcutta

প্রস্তুতকারক

দি এস্‌বেস্‌টস্‌ প্রোডাক্টস্‌ কোং

৮৪এ, ক্লাইভ্‌ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি

ও

রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য আপনার

অর্ডার প্রার্থনা করি

আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মজুত মাল আছে।

সায়েণ্টিফিক সাপ্লাই (বেঙ্গল) কোং

২৯ ও ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

(নূতন নম্বর—Block C No. 37 & 38 College Street Market) 1st. floor

ফোন নং—বড়বাজার ৫২৪।

টেলিগ্রামের ঠিকানা—"Bitisynd" Calcutta.

Manufactured in India

ANTISEPSIN

The soverign remedy for all troubles of the

Mouth & Skin

ELECTROLYTIC CHLORINE

(SANCO BRAND)

World's best Antiseptic, Disinfectant & Water-steriliser

"The cleanest and most rapid disinfectant for general work"

Major A. H. Napier, M. D., I. M. S.

To be had of all Chemists & Druggists

or direct from the manufacturers

SANCO LABORATORIES & WORKS

COSSIPORE, CALCUTTA

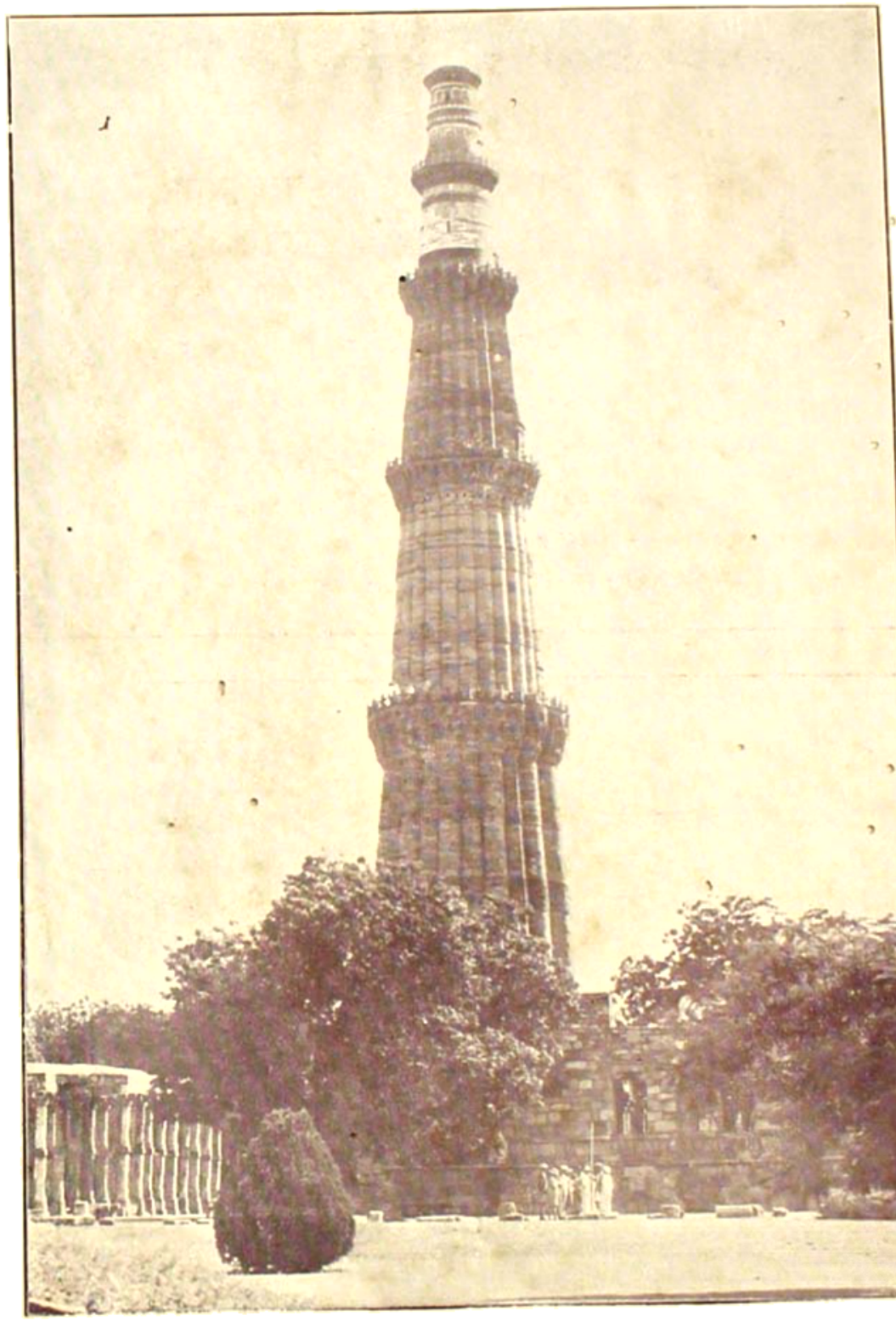

জগতের অনুকরণীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন

দিল্লির কুতব্ মিনার

১ম বর্ষ | মাঘ—১৩৩৭ | ১ম সংখ্যা

মায়ের ডাক

ভাষা দাও ভাষা দাও হে মোর সন্তান।
বিজ্ঞানের ভাষাহীন,
র'ব আর কত দিন,
ভাষা দিয়ে দীনতার কর অবসান॥

দারিদ্র্যে ঢেকেছে দেশ মেঘের সমান।
তা হ'তেও ভয়ঙ্কর,
অজ্ঞানের অন্ধকার,
বিজ্ঞানের আলো জেলে হও আগুয়ান॥

ভারতের বিজ্ঞানানুশীলনের বিশিষ্টতা

[অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ সেন]

ভারতবর্ষের আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবস্থা ও পুরাকালে কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা বিশেষে তুলনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। চরক সংহিতা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে একসময় মহর্ষি অগ্নিবেশ বহুবিজ্ঞ সমভিব্যাহারে কাম্পিল্য নগরে নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও ঔষধিবর্গ নিরীক্ষণ করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন যে এই কাম্পিল্য নগর তেত্রিশ বৎসর মধ্যেই মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হইবে। বহু মনুষ্য, বহু গো অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশু সেই সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এজন্য জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া শিষ্যগণকে শতযোজন পথ অতিক্রম করিয়া মহামারী প্রতিষেধ জন্য ঔষধি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। মহর্ষি চরককে স্বর্গলোকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিকটে আয়ুর্বেদ পাঠ করিতে ও চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া ভূলোকের সেবা করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তেত্রিশ বৎসর পরে সেই ভীষণ মহামারীতে কাম্পিল্য নগর ধ্বংস মুখে পতিত হইল। ঋষিরা যতদূর পারিলেন ততদূর পর্য্যন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দ্বারা মহামারীর প্রকোপ হ্রাস করিতে যত্নবান হইলেন।

ইউরোপ খণ্ডে প্রথম চিকিৎসকগণ রোগমুখে আকৃষ্ট হইয়া রোগ ও মল ব্যাধিমুক্ত করিয়া পরে চিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্ত করিতে উৎসাহান্বিত হইয়া চিকিৎসায় শ্রদ্ধা করেন।

এই সামান্য ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই ইউরোপের জ্ঞান, সাধনা ও অর্থ কাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের জন্যই ভারতের ঋষিগণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবের দুঃখে কারুণ্য পরবশ হইয়া তাঁহাদের বহু চিন্তা, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞান ও সত্য জগতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভিত্তি ভূয়োদর্শন, পরীক্ষণ ও সিদ্ধান্ত দ্বারা সত্য নিরূপণ। এই তিন ভিত্তি মানবজাতি যে স্থানেই হউক, অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, স্থপতি বিদ্যার আলোচনা করিয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্য সমূহ নির্ণয় করিয়া জগতের অনেক দুঃখের লাঘব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

আয়ুর্বেদ মধ্যে বহু বিভাগ আছে এবং তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ, শলাক্য, শালাক্য, কুমারভৃত্য প্রভৃতি চরকসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন এবং শুক্রাচার্য্য প্রণীত নীতিশাস্ত্রে মদ্য ও আসব করণ, সবজেদ্য, আদ্যাদ্য পদার্থের পাক প্রণালী, বৃক্ষরোপণ তমস্করণ ধাতুদ্রব্যাদির জারণ, মারণ প্রভৃতি, লবণ, ক্ষার পদার্থ প্রস্তুতকরণ, মণিরত্নাদির পরীক্ষা ও বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করণ এই সমস্ত ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় এদেশে রসায়ন বিদ্যাও বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কাল প্রভাবে এ সমস্ত বিদ্যা আজ প্রায় লোপ হইয়াছে এবং ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্র এ স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

স্থাপত্য বিদ্যায় মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বহু নিদর্শন শুক্রাচার্য্য প্রণীত নীতি শাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্থাপত্য বিদ্যা পাঠ করিতে হইলে জড়বিজ্ঞান অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ জড়বিজ্ঞানের আভাস দিয়াছেন কিন্তু মহর্ষি প্রণীত নাড়ীবিজ্ঞান আজও কবিরাজ মহাশয়েরা বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করেন ও রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

একশত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গণিত শাস্ত্রে, রসায়ন বিদ্যায়, জড়বিজ্ঞানে, চিকিৎসা শাস্ত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাহা যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহাও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল কিন্তু এই সময় মধ্যে ভারতবর্ষের অবনতি ও ইউরোপীয়দিগের অপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান, অস্ত্রশাস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতির সংখ্যা অতিশয় অল্প। সংস্কৃত চর্চ্চা ৫০,৬০ বৎসরের মধ্যে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বা ইউরোপীয় ভাষার অনুকরণে আলোচিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে চিন্তাশীল লোক স্থির, ধীর, গম্ভীর প্রকৃতি সম্পন্ন এবং চিন্তাশক্তিই সকল শক্তির মূল স্বরূপ এজন্য বহুস্থানে আজ কাল বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু প্রণালী ইউরোপীয় প্রণালী। ভারতবর্ষের চিত্তসংযম, আত্মচিন্তা ও একাগ্রতা আজও সামান্য নহে। আমাদের আশা আছে যে আগামী ১০।১২ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষ অভিনব বৈজ্ঞানিক উন্নতি লাভ করিবে।

আধুনিক কালে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির ধারণা যে ভারতবর্ষে কখনও বিশেষভাবে জড় বিজ্ঞানের অনুশীলন হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে রেলগাড়ী বা বাষ্পীয়-যান, তাড়িৎবার্ত্তাবহ, বেতারবার্ত্তা, আকাশ-মার্গে বিচরণশীল ব্যোমবাহিনী, সমুদ্রমধ্যে গতিশীল ডুবজাহাজ, সমুদ্রগামী বিশাল অর্ণবপোত, স্বয়ং কিরণ বিকীর্ণকারি রাসায়নিক দ্রব্য রেডিয়াম প্রভৃতি এদেশে ছিল না এবং এখনও আমাদিগের দেশের লোক এই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। এ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে যন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার করিতে না জানিলে, কল কারখানায় কোন লাভ নাই।

গত একশত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে ইউরোপীয় জাতিদের এই অভিনব উন্নতি এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীনতের কারণ কি এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হয়।

নিম্নলিখিত কারণগুলি বিবেচ্য বিষয়:—প্রথম শক্তি এই সকল বিষয়ে কেন তাহারা করিতে পারেন অন্যে তাহা করিতে সমর্থ নহেন এবং এই শতাব্দীর ১৮৩৪ সালে লর্ড মেকলের মন্তব্য অনুসারে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত ভাষায় কি আছে কি না আছে, কোন্ অংশে আলোচনা যথেষ্ট ভাল করিয়া করা আবশ্যক তাহার বিচার না হইয়াই দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন হইল এবং তজ্জন্য দেশবাসীগণ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া বিজ্ঞান, রসায়নাদি শাস্ত্রে মনোযোগ দিলেন। এই সময় ৺মধুসূদন দত্ত মহাশয় প্রথমে শবচ্ছেদ করেন এবং তাঁহার নাস্তিকতার জন্য কলিকাতা দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল। হিন্দু-কলেজ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু তথায় রিচার্ডসন্, ডিরোজিও প্রভৃতি স্বাধীন চিন্তা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের শিক্ষায় তৎকালে হিন্দুকলেজের বহু ছাত্রেরই মানসিক ভাব ইউরোপীয় ভাষা, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যার আকর্ষণ হইয়াছিল এবং ৺মধুসূদন দত্ত এই স্থানেই পাঠ অভ্যাস কালীন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়া বিলাত গমন করেন। ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া বিলাতে ব্যবহারজীব হইবার জন্য প্রেরণ করেন। ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পুরাতন শিক্ষা দীক্ষার পক্ষ সমর্থন করেন এবং শব্দকল্পদ্রুম সংগ্রহ করিয়া যাহাতে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান সহজে বোধগম্য হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন কিন্তু ৺রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচলনের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন।

১৮৩৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষার প্রণালী সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে এবং

লোকে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই পরস্পরের সহিত মনের ভাব বিনিময় ইংরাজি ভাষায় করিয়া থাকেন সংস্কৃত ভাষায় প্রায়ই করেন না। এজন্য একরকম ইউরোপীয় পণ্ডিত গণের মতেই বহুস্থানে সংস্কৃত চর্চ্চা হইতেছে।

দ্বিতীয় কারণ—ক্রমশঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষীয় লোকের মানসিক অবস্থার বিস্তর অবনতি ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জল প্লাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক উপসর্গে বহু প্রজা হানি হইয়াছে এবং অখাদ্য পদার্থের দুর্মূল্যতার জন্য নানাপ্রকার ব্যাধির প্রকোপে সমগ্র ভারতবর্ষ অতীব ক্লিষ্ট। এ সমস্ত ব্যাধির প্রতিকার কিন্তু হইতেছে না। এই নিমিত্ত দেশের দুর্গতি হইতেছে।

তৃতীয় কারণ—যাঁহারা সমাজে জ্ঞানে, মানে ও ধনে বহুজনের সম্মান ভাজন তাঁহারাও ইউরোপীয় ভাবে অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন সাধারণ লোকে তাহাই অনুবর্ত্তন করিয়া আপনাদিগের মধ্যে ভাষা করিতে ইচ্ছুক হন। এই কারণেও সংস্কৃত শিক্ষা ও প্রাচীন সংস্কৃতির উপর বহুলোকেই আস্থাবান্ নহেন।

চতুর্থ কারণ—বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়ের ঘরেই আজ দারুণ অর্থাভাব এজন্য তাঁহারাও নিজ পরিবার-বর্গের অর্থকষ্ট মোচন জন্য তাঁহাদিগের সন্ততি মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা দিতে সমধিক উৎসুক হইয়াছেন।

পঞ্চম কারণ—যাঁহারা ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষার ফলে বহু অর্থ অর্জ্জন করেন তাঁহারাও পুরাতন সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

এই সমস্ত দুঃখের প্রতিকার করিবার উপায়, ভারতের শিক্ষার ভার ভারতবর্ষেরই মনস্বী লোকের গ্রহণ করা। এই নিমিত্ত ১৯০৭ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তথায় ও সেই ইউরোপীয় ভাবের প্রাদুর্ভাব জন্য বিশেষ কিছুই হয় নাই।

ভারতবর্ষের যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তাহার জন্য প্রতি ভারতবাসীর নিকট আমরা করযোড়ে প্রার্থনা করি এবং সকল বস্তুরই যথোজ্ঞান বিচার পূর্ব্বক গ্রহণীয়।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহুবিধ বিভাগ প্রাচীন ভারত মধ্যে প্রচলিত ছিল। রসায়ন তন্মধ্যে একটী। এই রসবিদ্যা অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া দু পাঁচ জন অন্তরঙ্গ কৃতবিদ্য ছাত্র মধ্যে আচার্য্য মহোদয় প্রকাশ করিতেন এবং এইরূপেই এই বিদ্যা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পারদ পদার্থের ঔষধে ব্যবহার ও সুবর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি করণে প্রয়োগ।

আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান মতে স্বর্ণ ও পারদের অনুমধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির ঐক্য ও তারতম্য আছে এই জন্য স্বর্ণ ও পারদ দুইটী মৌলিক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত কিন্তু সামান্য বিদ্যুৎ শক্তির সমন্বয় হইলেই পারদ সুবর্ণে পরিণত হইবে।

কৃষ্ণাদির রস গ্রহণ করিয়া পারদ সহিত মর্দ্দন করিলে পারদ ভস্মাকারে পরিণত হইয়া যায় কিন্তু এই ভস্ম স্থায়িভাব পায় না কারণ এই রসবিদ্যার যে গূঢ় ব্যবহার হয় তাহা অধুনা অজ্ঞাত। যথে (গোজিহ্বা) শাক পত্রের রসের এই গুণ আছে কিন্তু ৫।৬ দিন পরে এই ভস্ম হইতে পারদ পুনশ্চ আসিয়া পড়ে এজন্য প্রকৃত প্রণালী সহজ পরীক্ষা দ্বারা বোধগম্য হয় না। এ বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে পারদ ভস্ম করা অতিশয় দুরূহ রহিবে। পুনশ্চ দৃষ্টান্ত স্বরূপ লৌহ প্রভৃতি সংজ্ঞে ভস্মীভূত করা যায় না। কিন্তু সাঁওতাল পরগনার সামান্য কাষ্ঠের অগ্নিতে এক বৃক্ষ পত্রের রস সংযোগে উহা জলের ন্যায় তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তাহা নয়নপুর, বৈদ্যনাথ, দুমকা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিতে কামারেরা লইয়া যায়। আমাদিগের এ

সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা থাকিলেও তাহা নিজ হইবার উপায় নাই। কারণ এই সমস্ত কামার জাতীয় লোকেরা সহজে এই বৃক্ষপত্রের রস দ্বারা লৌহ সামান্য কাষ্ঠাদিতে দ্রবীভূত করিবার বিদ্যা অপর জাতীয় ব্যক্তিকে শিখাইতে অনিচ্ছুক। আমাদের এক পরিচিত বন্ধু এই বৃক্ষের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং তিনি ৺রসময়াপেরের মন্দিরোপরি যে লৌহের সুদর্শন চক্র আছে ও নিম্নীতে যে লৌহের মুদ্গর আছে তাহা এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

মধুপুর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতে এই বৃক্ষ প্রচুর ভাবে জন্মায় ও তথায় লৌহ প্রস্তুত হয়। এই লৌহ অতিশয় কঠিন। সহজে জলে বা বায়ুতে এই জাতীয় লৌহের বিকৃতি হয় না এবং রাসায়নিক পরীক্ষায় যে শতকরা ৯৮ ভাগের উপর বিশুদ্ধ লৌহ আছে তাহা পূর্ব্বে ডাক্তার কানিংহাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ লৌহের স্তম্ভ বা চক্র আজও ইউরোপীয় লৌহ কারখানায় প্রস্তুত হয় নাই।

গয়ার নিকট ফল্গু নদীতে বালুকা মধ্যে অত্যল্প পরিমাণ প্লাটিনাম ধাতু আছে তাহাও আমরা ডাক্তার ৺প্রবোধ নাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি। আমি উহা দেখি নাই কিন্তু তুঁতিয়ার তাঁহার বিশেষ আলোচনা প্রভাবে তিনি উহা আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি উহার ব্যবহার হয় নাই।

ঠিক আধুনিকালের ধরণের জিনিষ পত্র না থাকিলেও তদ্রূপ পদার্থ যে ভারতবর্ষে একেবারেই ছিল না তাহা বলিতে সাহস হয় না।

এ বিষয়ে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পথের ধারা

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

আদিম অবস্থায় মানবজাতি বৃক্ষকোটরে বা পর্ব্বতাদির গুহায় বাস করিতেন; ফলমূল ও অপক্ক মাংস আহার করিতেন। শীত নিবারণের জন্য নিহত পশুচর্ম্মে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া অনেকে একত্রে শয়ন করিতেন।

বনে দাবানল সকারের সময় অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় তাঁহারাও বনান্তরে পলায়ন করিতেন। কিন্তু কোনও এক শুভ-মুহূর্ত্তে কোনও মানব অগ্নির জীবনিবারণী শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। তাহার পর ক্ষুধার তাড়নায় একদিন অগ্নিদগ্ধ কোনও জীবের মাংস আহারে কেহ আশাতীত তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকিবেন। ইহার পর অগ্নি মানবজাতির নিকট আদরনীয় হইল। এই সময় হইতে মানবজাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হইল।

ক্রমে একদিন বনে বনে আহারানুসন্ধানে ভ্রমণের সময় কেহ শুষ্ক শাখায় শাখায় ঘর্ষণের ফলে অগ্নির উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া পরে স্বয়ং দুইটী শুষ্ক শাখার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে করিতে কেহ একদিন কৃতকার্য্য হইয়া থাকিবেন। এই মুহূর্ত্ত মানবের চিরস্মরণীয়; কারণ এই শুভক্ষণে মানব-সভ্যতার জন্ম।

সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত এইরূপেই প্রাকৃতিক ঘটনার তত্ত্বানুসন্ধান, ও মানবের নানাপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে উহাদের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োগ

হইয়া আসিতেছে। এই প্রয়াসের ফলেই ক্রমশঃ মানব সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, এবং ফলতঃ ইহারই নাম "বিজ্ঞান চর্চ্চা"। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বর্ণনা ও বিচার একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার নাম "বিজ্ঞান-শাস্ত্র" দেওয়া হইয়াছে।

জগতের আদি বৈজ্ঞানিক—যিনি অগ্নির আবিষ্কারক, তাঁহার সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত একই প্রথায় বিজ্ঞান চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে—প্রাকৃতিক ঘটনা অবলোকন, কৌশলে উপায়ে উহার প্রবর্ত্তন, বিচার এবং পরিশেষে উহার নিয়োগ।

মহামায়ার লীলায় মানব হৃদয়ে নিত্য নূতন অভাবের উদয় হইতেছে—এবং তাহারই নিরাকরণের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান শাস্ত্র ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে।

সুতরাং মানবজাতির জ্ঞানোন্মেষ, বিজ্ঞান চর্চ্চা আশ্রয় করিয়া; মানব-সভ্যতার বিকাশ, বিজ্ঞান-নিয়োগ অবলম্বনে। দেশের প্রকৃত সভ্যতার পরিণাম, দেশবাসীর নিত্য প্রয়োজনে বিজ্ঞান-নিয়োগের বিবৃতি।

এই প্রথানুযায়ী পরিণামে দেখা যায়, আমাদের সভ্যতা নিরন্তরে বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ অবস্থাটী অল্প দিনের মধ্যে ঘটিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে সভ্যতা উন্নত ছিল। যে যুগে আমাদের দেশে "অশোক গুপ্তের" শাসন সম্ভব হইয়াছিল, সে যুগে আধুনিক ইউরোপীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা নগ্নাবস্থায় বনে বনে বিচরণ করিতেন।

আমাদের এই দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী। বলা বাহুল্য, যে শিক্ষাপ্রণালীতে বিজ্ঞানের স্থান নাই, তাহা জাতির কল্যাণকর হইতে পারে না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব আলোচনা করিলে উহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইংরাজ ব্যবসায়ী-গণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ঘটনাচক্রে ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিলেন। কিন্তু বাণিজ্য ও অন্যান্য নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, যথাসম্ভব অল্প-কালমধ্যে সমাধান করিয়া স্বদেশে প্রস্থানই তাঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রহিল। এ জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু উহা সময় ও কষ্টসাপেক্ষ। বিশেষতঃ ইংরাজের স্বভাব জড়িত-কণ্ঠে এ দেশের ভাষা উচ্চারণ অসম্ভবই বোধ হইত। তাহার পর বাণিজ্যাদির জন্য ইংরাজী ভাষাজ্ঞ কেরাণীর প্রয়োজন। সে কেরাণী স্বদেশ হইতে আনয়ন সাতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। তদুপরি স্বদেশীয় দ্বারা যথেচ্ছা আদেশ পালনের বহু অসুবিধা। সে যুগে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতেন, তাহা স্বদেশ বাসীর নিকট হইতে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখাই তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় ছিল। এ সকল ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা কোনও ক্রমে লিখনে, পঠনে ও কথোপকথনে এ দেশবাসীকে অভ্যস্ত করিলে ইংরাজ বণিকের বহু সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল।

এ জন্য ভারতীয় কোনও ব্যক্তির সামান্য মাত্র ইংরাজী জ্ঞান থাকিলেই ইংরাজ তাঁহাকে প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। এইরূপে ইংরাজী শিক্ষা ক্রমে এদেশে সকলের লোভনীয় হইল। তখন উপযুক্ত আড়ম্বরের সহিত "শিক্ষার" ব্যবস্থা হইল—যেন ইংরাজ বণিকের কেরাণীর অপ্রতুল না ঘটে। শিক্ষাপ্রণালী তদনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইল; এবং তদবধি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় "উচ্চশিক্ষার" নামে ক্রমাগত সুযোগ্য কেরাণীরূপ সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

অবশ্য বিজিত জাতিসুলভ অনুকরণ প্রবৃত্তি না থাকিলে আমাদের এ দশা ঘটিত না। এক্ষণে সময় হইয়াছে আমাদের অবস্থার সম্যক উপলব্ধি ও তাহার প্রতীকার প্রয়াসের।

বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতানুগামী জ্ঞানের বহুল প্রচারই জাতীয় উন্নতির সোপান। আমাদের দেশে এরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কোনও একটী বিদেশী ভাষা প্রথমে উত্তমরূপে শিখিতে হয়। ইহা সাতিশয় সময়সাপেক্ষ। ফলে, অন্যান্য জাতি যে জ্ঞান এক বৎসর শিক্ষার ফলে লাভ করে, আমাদের দেশে সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর শিক্ষা আবশ্যক হইয়া থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাল্পতা লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পূর্ব্বে একথাটী বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত। কোনও দেশের ছাত্রকে আমাদের ছাত্রের ন্যায় অস্বাভাবিক অসুবিধার ভিতর বিদ্যাভ্যাস করিতে হয় না।

সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য, অবিলম্বে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানাদি নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা ও সেই সকল পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; মাতৃভাষায় বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা ও গবেষণার প্রচার। যাঁহারা কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, মাতৃভাষায় তাঁহাদের লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা। ইহাই প্রকৃত গঠন মূলক কার্য্য। দেশ সেবায় ইহার মূল্য সামান্য নহে।

এই সকলের অভাবেই আজ বিজ্ঞান আমাদের নিজস্ব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ধারণা হয় যে, উহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিক্ষাদান মাত্র। আমরা ভুলিয়া যাই যে জ্ঞান কোনও জাতিবিশেষের সম্পত্তি হইতে পারে না। ভৌতজগতে জলাশয়ের জল হইতে মেঘের উৎপত্তি ও মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত—ইহা সকল জাতির পক্ষেই সত্য; এবং ইহা লক্ষ্য ও আলোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু বিদেশী ভাষায় ইহার আলোচনা করিলেই উহা অনধিকার চর্চ্চা বা বিদেশী জাতির অনুকম্পা ভোগ বলিয়া বোধ হয়।

বিদেশী আমাদের বুঝাইয়াছে যে আমাদের দেশে রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতির তাহারাই প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইহা অংশতঃ মাত্র সত্য। অন্যান্য দেশেও এই সকল প্রতিষ্ঠান ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং সে সকল দেশে বিদেশীর হস্তক্ষেপ আবশ্যক হয় নাই। যুগধর্ম্মের ফলে এই সকল প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব অপরিহার্য্য হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে ইংরাজ আমাদের দেশে ফুসবার্ত্তা বহনের দূত হইয়াছিলেন মাত্র। উহারা না থাকিলেও উক্ত প্রকার যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

এই সকল তথ্যের প্রচার আবশ্যক হইয়াছে, আমাদের আত্মগ্লানি দূর করিয়া আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতা প্রতিষ্ঠার জন্য।

বিজ্ঞানের ভাষা

আমাদের প্রতিনিধি কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান শুশ্রূষিৎ ডাঃ বি, এন, দের সহিত তাঁহার বরানগরস্থ বাস ভবনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি শয্যার পরিচিত ছিলেন। অন্যান্যকে উন্নতির সমুচ্চ শিখরারূঢ় ও পুনঃ সুস্থসমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখিবার মহৎ-আকাঙ্খা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে। ডাঃ দের মতে একমাত্র বিজ্ঞানই দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনে সক্ষম। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল।

প্রঃ। ইউরোপ ও আমেরিকায় দীর্ঘ প্রবাসের পর বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমে আপনার কি মনে হইয়াছিল?

উঃ। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একটী প্রাচীর গাত্রে কয়লা দিয়া লিখিত "চিত্তরঞ্জন এভিনিউ" শব্দটী দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, তদ্নিম্নে ঐ কথাটী বাঙ্গলায়ও লেখা ছিল। মনে হইল যেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষার 'এভিনিউয়ের' প্রতিশব্দ ছিলনা বা কথাটী সম্পূর্ণ ইংরাজী অক্ষরে লেখা চলিত না। যদি বাঙ্গালার লোক ও কলিকাতার পৌরকর্ত্তা নবনির্ব্বাচন করদাতা এখন বুঝিয়া থাকেন যে রাস্তাগুলির নাম সাধুভাষায় হওয়া উচিত অবশ্য যাহা বহুপূর্ব্বেই করা উচিত ছিল, তবে তাহা নিশ্চিত ভাবেই সম্পন্ন হওয়া উচিত।

তৎপরে ঘটনাক্রমে একদিন আমি স্থানীয় একটী কলেজে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ ও অনুচ্চাঙ্গ প্রায় দুইশত ছাত্র গণিত অধ্যয়ন করিতেছে। অধ্যাপকটী বাঙ্গালী, ছাত্রগণও তাই কিন্তু তাঁহার বক্তব্য বিষয় ইংরাজী বলিবার জন্য প্রবল প্রয়াস লক্ষিত হইল। আমি বলিতে বাধ্য হইব যে ছাত্রগণের দ্বারা ইংরাজি ও গণিতশাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার আপ্রাণ চেষ্টা ও অধ্যাপকের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হইল।

প্রঃ। আচ্ছা ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত উচ্চাঙ্গের গণিত শাস্ত্র আয়ত্ত করা কিরূপে সম্ভব?

উঃ। গণিত কিম্বা অন্যান্য বিজ্ঞান ব্যক্তিগত কোন মনুষ্য বা কোন জাতির সম্পত্তি বা নিবূঢ় অধিকারভুক্ত নহে। এদেশে গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং কিরূপে আরব হইতে রূপান্তরিত হইয়া উহা ইউরোপে গৃহীত হইল ইহা কে না জানে? এই পুরাতন তথ্য ব্যতীতও আমি দেশবাসীর সম্মুখে ইংরাজী ভাষার অনভিজ্ঞ গণিত শাস্ত্রবিদ্ রামানুজের জীবনীর উল্লেখ করিতে চাহি। যদি তাঁহাকে গণিত-শাস্ত্রের প্রাথমিক তথ্য ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা করিতে হইত তবে হয়ত তাঁহার এ জীবনে আবির্ভাব সম্ভবপর হইত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যথোপযুক্ত সুযোগের অভাবেই প্রায়শঃ প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। গভীর চিন্তাধারা প্রাকৃতিক ভাষা বিহনে যথাপি ব্যক্ত করা যায় না; তাই আজ বাঙ্গালার আশাপ্রদ লক্ষ লক্ষ যুবক জীবনের ব্যর্থতাও উপলব্ধি করিতেছে।

প্রঃ। আপনার জীবনের এই সাফল্য বিদ্যা, বুদ্ধিবৃত্তি সবই কি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আয়ত্ত হয় নাই?

উঃ। আমার ভারতীয় কিম্বা বৃটীশ শিক্ষাগার সমূহের নিন্দাবাদ করিবার স্পৃহা নাই কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে দৈবক্রমে শিবপুর পূর্ত্তবিদ্যা বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় আমাকে

চিত্তরঞ্জন বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে দুইজন সুদক্ষ শিক্ষক সকল সংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়া আমাকে মাতৃভাষার গণিত ও বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা দেন। আশা করি দেশবাসীগণ স্বর্গীয় গর্ডনিংহের "পাঠশালায় আমার গণিতের জ্ঞান আমার জীবনের সর্ব্বপ্রকার উচ্চপদ লাভের কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল" এই বাক্যের গুরুত্ব বিস্মৃত হইবেন না।

প্রঃ। ইংরাজী ভাষার অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের দেশে সার পি, সি, রায় ও জগদীশ বসু জন্মিয়াছেন!

উঃ। হাঁ, আপনার প্রশ্নই এই কথার উত্তর দিতেছে; অর্থাৎ বৈদেশিক ভাষার এত অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহাদের বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতের সন্তানগণ দীর্ঘকাল যে এই বৈদেশিক ভাষার গুরু নিষ্পেষণ সহ্য করিতে পারিয়াছে ইহাই ভারত প্রতিভার বৈচিত্র। গণিত, বিজ্ঞান, পূর্ত্ত-শিল্প প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে আয়ত্ত করা কী ভয়ানক অসুবিধার কথা! আমাদের দেশে যে বহু প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয় নাই ইহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এমন অসাধারণ ধীশক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র একজন পি, সি, রায় ও একজন জগদীশ বসুর উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু যদি শিক্ষার ভিত্তি মাতৃভাষার সাহায্যে গড়িয়া উঠিত তাহা হইলে এতদিনে বহু পি, সি, রায়, জগদীশ বসু ও সার এম্ বিশ্বেশ্বরের আবির্ভাব হইত।

প্রঃ। কিন্তু আমাদের সেই বহু আলোচিত পাঠ্য পুস্তকের সমস্যার সমাধান ত হইল না?

উঃ। যদি একবার লোকে জ্ঞানার্জ্জনে মাতৃভাষার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে তবে অনতিবিলম্বেই পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীভূত হইবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে যদি পঞ্চবর্ষের স্থায় একটী দীর্ঘ তিনিদের প্রয়োজন হইতে পারে তবে বৈদেশিক ভাষার অপসারণান্তে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা যে কত বড় তাহা সহজেই অনুমেয়। দেহের শোণিতবিন্দু হইতে প্রিয়তর, মানব অন্তরাত্মার শুদ্ধতমপ্রদেশের অমূল্য সম্পদ এই ভাষা। কি নৈতিক, কি আর্থিক, কি আধ্যাত্মিক সব ক্ষেত্রেরই উৎকর্ষ সাধনে অদ্বিতীয়। একবার এই তথ্য, দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইলে জাতীয় প্রতিভা স্বাধিকার বজায় রাখিয়া উচ্চাঙ্গের পাঠ্য পুস্তকে পুনরায় দেশ পূর্ণ হইয়া যাইবে। আমরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া "বঙ্গীয় পূর্ত্ত বিজ্ঞান পরিষৎ" নামক একটী সমিতি গঠন করিয়াছি, এবং তাহার সভ্যগণ বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান ও অন্যান্য সাহিত্য রচনায় কঠিন পরিশ্রম করিতেছেন। এ কার্য্যে অর্থের আবশ্যক, সুতরাং আমি এই পরিষদের রক্ষা কল্পে জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব ইচ্ছা আছে। আমি বিশ্বাস করি কতিপয় জনহিতৈষী মহোদয় অগ্রণী হইয়া এই সমিতিকে সাহায্য করিবেন।

প্রঃ। বাণিজ্য, ভাষা হিসাবেও কি আপনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না?

উঃ। যাহারা বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতের বাহিরে যাইবে কিম্বা সাহিত্য সম্পদ অর্জ্জনাকাঙ্ক্ষা ও আমেরিকা ও ইউরোপের আধুনিক আবিষ্কার সমূহের জ্ঞান স্পৃহা যাহাদের আছে তাহারা বরং ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করিতে পারে।

বাণিজ্য পরিচালনায় ইংরাজী ভাষা সহায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে ইংরাজী কিংবা অপর কোন বৈদেশিক ভাষা আয়ত্ত করাই যে অপরিহার্য্য তাহা নহে। পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ জাতি ভারতে বাণিজ্য রক্ষার্থে কি বাঙ্গালা বা হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল? পক্ষান্তরে বহু ইংরাজী অনভিজ্ঞ

ওয়রাটী জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জিনিষের ব্যবসা করিতেছেন।

সার পি, সি, রায় এসম্বন্ধে অতি সুনিশ্চিত ভাবে বলিয়াছেন। ইউরোপ যাত্রা কালীন জাহাজে ফ্রান্সের টুপি ব্যবসায়ী একটী ভাটিয়াকে ইংরাজীতে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে তীব্র উত্তর পাইয়াছিলেন—"হাম ইংরেজী নেহি জানতে হে" তাঁহার এই অভিজ্ঞতাই আপনার প্রশ্নোত্তরের পক্ষে যথেষ্ট। আমার এবং "পূর্ত্ত-বিজ্ঞান পরিষদের" অন্যান্য সদস্যগণের এ বিষয়ে কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যদি আপনার কিম্বা দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের অধিক জানিবার আগ্রহ থাকে তবে আমার অনুরোধ এই যে আপনি অন্য একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, কারণ আমার মতে এ বিষয়ে বর্ত্তমানে যে আলোচনা হইল তাহাই যথেষ্ট।

পরীক্ষা

[অধ্যাপক হেমন্তকুমার সেন]

নারদ কহেন, "বলে দাও প্রভো ! শান্তি কখন হ'বে ?
তোমার চরণে সকলি দিয়েছি,
তোমাকেই শুধু আপন জেনেছি,
মহিমা তোমার করেছি প্রচার মিশায়ে বীণার রবে,
সাধনার ধন ! বলে দাও, মোর শান্তি হইবে কবে ?"

ঈষৎ হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ, "প্রেম বিনা কিছু নাই,
চির কাল আমি প্রেমে বাঁধা আছি,
প্রেমিকের প্রাণে সদাই রয়েছি,
পূর্ণ প্রেমের বিকাশের মাঝে চঞ্চলতা যবে নাই,
শান্তি আসিয়া বিরাজে তখন, "রাধা"-পাশে তাই রাই"।

ব্যথিত হইয়া কহেন শিষ্য, "এ কি এ নূতন ভাণ ?
ক্ষমা কর হরি বাচালতা মোর,
তোমার প্রেমেতে হইয়ে বিভোর,
দিবানিশি করি বন্দনা তব তুলিয়া বীণার তান !
তবু বুঝিনু "রাধিকার" প্রতি আছে তব বেশী টান !"

"অভিমান ত্যজ, ওহে ঋষিবর ! নহিক পক্ষপাতী,
রাধার প্রেমের নাহিক তুলনা,
নর নারী কভু ভিন্ন ভেবনা,
সময়ে বুঝিবে সত্য মিথ্যা, হ'য়োনা ক্ষুব্ধমতি,
শান্তি পাইবে প্রেমের মাঝারে, প্রেমই সবার পতি।"

কিছু কাল পরে কঠিন পীড়ায় কৃষ্ণ শয্যাগত ;
ভক্ত দুঃখ শুনিয়া অধীর,
সমবেত সবে, করে আঁখি নীর,
"মোদের কাঁদায়ে যেওনাক' হরি," বলেন ভক্ত যত,
শুধায় কৃষ্ণে, "কি উপায়ে তব ব্যাধি হবে প্রশমিত ?"

'আবেশে' বিভোর কহেন কৃষ্ণ, "হয়েছে 'সঘন' মোর,
'দুরারোগ্য' ব্যাধি অতীব কঠিন,
করেনা বচন এবে 'শক্তি হীন,'
পীড়ার যাতনা দূর হ'তে পারে, উপায় বড় কঠোর,
ভক্ত আসিয়া পদরজঃ তাঁর যেন যদি শিরে মোর"।

উপায় শুনিয়া শিহরিল সবে, এ উহার পানে চায়,
দেবর্ষি কাঁদিয়া কহেন, "শ্রীহরি !
একান্তই যদি যাবে পরিহরি,
ব'লনা মোদের এ দারুণ বাণী, প্রাণে সহা নাহি যায় !"
নয়নোন্মীলি' কহেন কৃষ্ণ, "তবে কি নাহি উপায় ?"

পাগলিনী প্রায় কহেন শ্রীরাধা,—"তব প্রেম-অভিলাষী
মোর পদধূলি 'শোভুক' মস্তক,
হো'ক তায় মোর অনন্ত নরক !
তুমি ত' বাঁচিবে, ওহে প্রাণসখা ! আমি যে তোমারি দাসী,"
হাসিয়া কৃষ্ণ শুধান নারদে, "কে মোর ভক্ত বেশী ?"

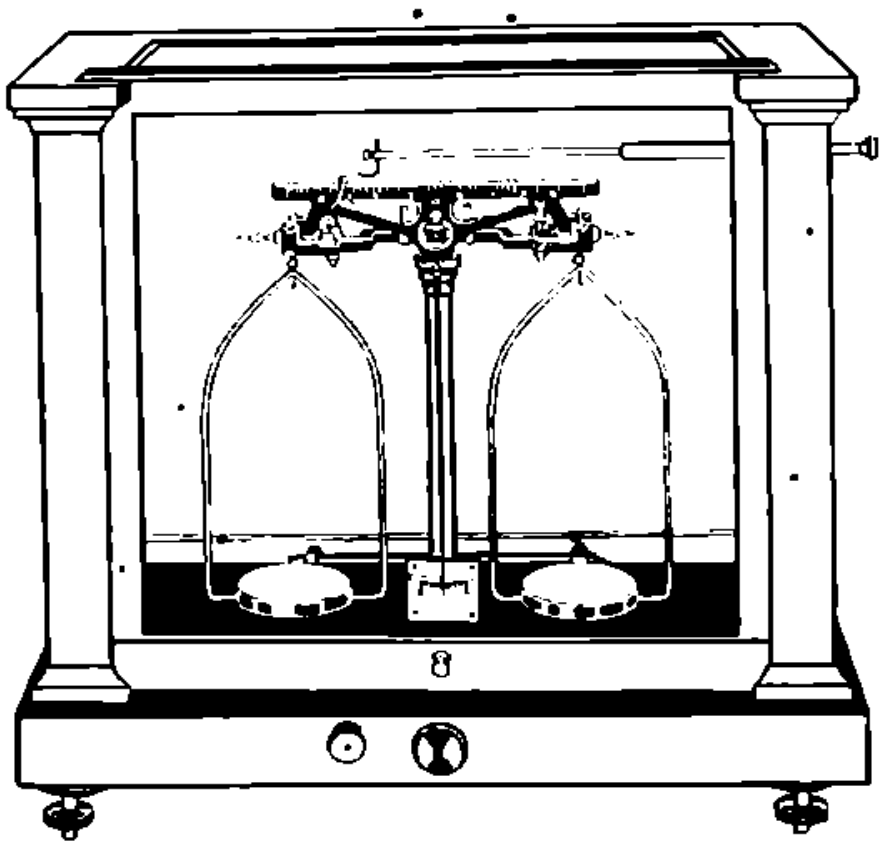

রাসায়নিক তুলাযন্ত্র

অজৈব রসায়ন

[শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়]

[১]

জগতে যাবতীয় "বস্তু" বা "পদার্থকে" আমরা প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি ; প্রথমতঃ বস্তুর আকৃতি, আয়তন, ভার বা বর্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক ধর্ম্মানুসারে, এবং দ্বিতীয়তঃ বস্তুর মূলগত অব্যক্ত ধর্ম্মানুসারে। বস্তু বা পদার্থের বাহ্যিক গুণালোচনা "পদার্থ-বিদ্যার" অন্তর্গত। বস্তুর মূল "দ্রব্য"। (১নং, ২নং, ৩নং চিত্র) ছুরী, হাতুড়ি, রেল, বন্দুকের প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ; কিন্তু এ সকলের মূল একই দ্রব্য "লৌহ"। এই দ্রব্যের বিশেষ "ধর্ম্ম" বা "গুণ" উক্ত সকল পদার্থেই বর্ত্তমান।

১নং চিত্র।

২নং চিত্র।

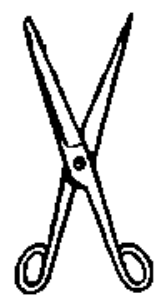

৩নং চিত্র।

এই রূপে হীরক ও কয়লা বিভিন্ন পদার্থ হইলেও উভয়ে একই দ্রব্য—"অঙ্গার"।

রসায়ন কি ?

উক্ত প্রকারে দ্রব্যগণের গুণালোচনাই "রসায়ন বিজ্ঞান।"

দ্রব্যের ধর্ম্ম বিবিধ :—আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত। দ্রব্যের রূপ ভেদে আকৃতিগত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়। এই ধর্ম্ম "আকৃতিক রসায়নে" আলোচ্য। দ্রব্যের প্রকৃতিগত ধর্ম্মালোচনার জন্য দ্রব্যগণকে "জৈব" ও "অজৈব" এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

রসায়নের বিভাগ।

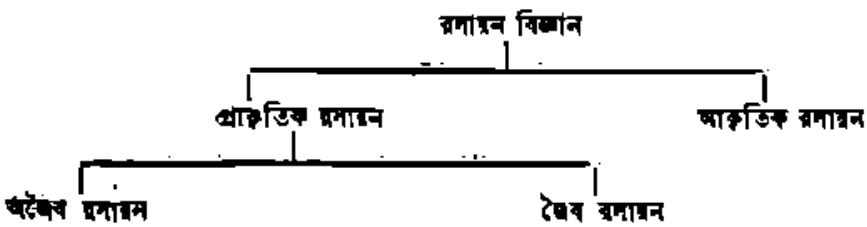

এ ক্ষেত্রে অজৈব রসায়নই আমাদিগের আলোচ্য।

[২]

পদার্থ বিজ্ঞানের অন্তর্গত কতিপয় সূত্র বিজ্ঞান মাত্রেরই চর্চ্চা অপরিহার্য্য। প্রথমতঃ ইহারই আলোচিত হইবে।

বস্তুর মূল পরিমাণ, বস্তুটীর "সত্তা" বস্তুর আকৃতি, আয়তন ইত্যাদি নানা কারণে পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু বস্তু বিশেষে "সত্তা" অপরিবর্ত্তনীয়। বস্তু মাত্রেই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষিত হয়। ইহাই পণ্ডিত নিউটনের "মাধ্যাকর্ষণ সূত্র"। উক্ত আকর্ষণকে "মাধ্যাকর্ষণ" বলা হয়। মধ্যাকর্ষণের বল, সত্তার সমানুপাতী। অর্থাৎ দুইটী বস্তুর মধ্যে একটীর সত্তা অপরটীর দ্বিগুণ হইলে প্রথমটীর উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব, দ্বিতীয়টির উপর যে প্রভাব হইবে, তাহার দ্বিগুণ।

সত্তা পরিমাণের কোনও সহজ উপায় না থাকায় সত্তার সানুপাতিক এই মধ্যাকর্ষণের পরিমাণকেই সত্তার পরিমাপক করা হয়। পরিমাণটীকে বস্তুর "ভার" বলে। কোনও পদার্থ "শূন্যের" যে পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহা সেই পদার্থের "আয়তন"। বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রসার (বা প্রস্থতা) ও বেধ (বা উচ্চতা) একত্রে আয়তন-নির্দ্দেশক। পরিমাণ প্রকাশ করিতে হইলে যে একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমেয় আবশ্যক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। নিম্নলিখিত পরিমেয় অনুসারে বিজ্ঞানালোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দৈর্ঘ্য বাচক সকল পরিমাণের—অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের আদি পরিমেয় প্যারী নগরে সুরক্ষিত একটী দণ্ডের দৈর্ঘ্য। দণ্ডটীর নাম মিটার। মিটারের সমতুল্য দৈর্ঘ্যকে "এক মিটার" বলে। মিটারের দশমাংশ "ডেসিমিটার" (ডেমিঃ) শতাংশ "সেন্টিমিটার" (সেমিঃ) ও সহস্রাংশ মিলিমিটারে (মিমিঃ)। দশ মিটারে এক "ডেকামিটার" (ডেকামিঃ) ও সহস্র মিটারে এক "কিলোমিটার" (কিলোমিঃ) হয়। এক মিটার ৩৯·৩৭ ইঞ্চির সমান।

এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, এক সেন্টিমিটার প্রস্থ ও এক সেন্টিমিটার উচ্চ ঘনক্ষেত্রের পরিমাণকে "এক ঘন সেন্টিমিটার" (ঘঃ সেঃ) বলে (৪নং চিত্র)। ইহা আয়তনের পরিমাপক। সহস্র ঘন সেন্টিমিটারে "এক লিটার" (লিঃ) হয়।

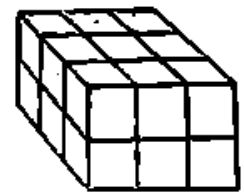

৪নং চিত্র।

এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তন বিশুদ্ধ জলের সত্তা ও তার সকল বস্তুরই সত্তা ও ভারের পরিমাপক। এই পরিমাণকে "এক গ্রাম" বলা হয়। গ্রামের শতাংশ "সেন্টি গ্রাম" (সেঃগ্রাঃ) সহস্রাংশ "মিলিগ্রাম" (মিঃগ্রাঃ) সহস্র গ্রামে "এক কিলোগ্রাম" হয় (কিলোঃ)। এক কিলোগ্রাম আমাদের "এক সেরের" কিছু অধিক (২·২ পাউণ্ড; ১সের=২·০৫ পাউণ্ড)

ভার পরিমাণের জন্য বিজ্ঞানেও তুলাদণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত আছে। রসায়ন-গত আলোচনায় অতি সূক্ষ্ম ভার পরিমাণ করার প্রয়োজন হয় বলিয়া বিশেষ যত্ন ও নৈপুণ্য-সহকারে রাসায়নিক তুলাদণ্ড নির্ম্মিত হইয়া থাকে। একটী লঘুদণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে "এগেট" (Agate) নামক এক প্রকার কঠিন প্রস্তর নির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র বিশেষাকৃতি ফলক প্রথিত হইয়া থাকে। ইহা মসৃণ সমতল অপর একটী ফলকের (এগেট নির্ম্মিত) উপর রক্ষিত হয়। শেষোক্ত ফলকটী একটী ধাতু নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর প্রথিত থাকে। দণ্ডটীর উভয় প্রান্তে সমান্তরে দুইটী চক্রাকার সমতার পাত্র বিলম্বিত হয়। দণ্ডের মধ্যস্থলে সংলগ্ন একটী দীর্ঘ "নির্দ্দেশক" দণ্ড স্তম্ভের নিম্নে সমান্তর

মানদণ্ডের সম্মুখে সঞ্চালিত হইয়া তার সমতা ও অসমতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

স্তম্ভটী দৃঢ়ভাবে একটী কাষ্ঠ বা প্রস্তরাদি নির্ম্মিত সমতল গত আসনে প্রথিত হয়। সমগ্র যন্ত্রটী কাচ নির্ম্মিত আবরণীর মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। আবরণীর বহির্দ্দেশে আসনটীর সহিত সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র সাহায্যে দণ্ডটী স্তম্ভের উপর যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে নির্দ্দেশকটী মানদণ্ডের উপর সঞ্চালিত হয়। এই সময় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে নির্দ্দেশকটী উহার মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে সমান দূরে সঞ্চালিত হইতেছে কি না। তুলাযন্ত্রটী ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকিলে দণ্ডটীকে স্তম্ভ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয়। উপরোক্ত আসন সংলগ্ন যন্ত্রটীর সাহায্যেই ইহা সম্পাদিত হয়।

দণ্ডটীর উভয় প্রান্তে দুইটী "ক্রু" সংলগ্ন থাকে। ইহাদের কোনটীকে দণ্ডমধ্য হইতে দূরে অপসারণ করিলে, সেই পার্শ্বে ভার সমধিক হয়। (ইহার কারণ এ স্থানে আলোচ্য নহে)। যাহাতে নির্দ্দেশকটী মানদণ্ডের উভয় পার্শ্বে সঞ্চালিত হয় তদনুযায়ী ক্রু দুইটী অপসৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুলাযন্ত্রটী নিরীক্ষিত হইল।

কোনও বস্তুর ভার পরিমাণের জন্য উহা যন্ত্রটীর বাম পার্শ্বের পাত্রে স্থাপিত হয়। পরে আধার হইতে প্রথমতঃ "১০০গ্রাম" চিহ্নিত তুলটী চিমটা সাহায্যে উত্তোলন করিয়া তুলাযন্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পাত্রে স্থাপিত হয়। এক্ষণে যন্ত্রটী উত্তোলন করিবামাত্র নির্দ্দেশক অনুভূত পার্শ্বে সঞ্চালিত হইবে। তদনুযায়ী দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পাত্রের তুল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

বিজ্ঞানে ব্যবহার্য্য তুল সাধারণতঃ ১০০ গ্রাম, ৫০ গ্রাম, ২০ গ্রাম, ১০ গ্রাম (দুইটী) ৫ গ্রাম, ২ গ্রাম, ১ গ্রাম, (তিনটী), ·৫ গ্রাঃ, ·২ গ্রাঃ, ১ গ্রাম (দুইটী) ৫ সেগ্রাঃ, ২ সেগ্রাঃ, ১ সেগ্রাঃ (দুইটী)। এইরূপে যন্ত্রটীর ভার দ্বিতীয় দশমিক সংখ্যা পর্য্যন্ত গ্রামে প্রকাশিত হইতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ দশমিক সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য একটী বিশেষ কৌশল অবলম্বিত হয়। দণ্ডটী দক্ষিণ পার্শ্বে ১০টী সমান ভাগে বিভক্ত ও চিহ্নিত হয়। একটী ১ সেন্টিগ্রাম ভার তাম্রনির্ম্মিত "আরোহী" ঐ দণ্ডটীর উপর রক্ষিত হইলে উহার ভার অবস্থানানুযায়ী ফলিত হইয়া থাকে। আরোহী দণ্ডমধ্য হইতে একভাগ দূরে অবস্থিত হইলে ফলিত ভার ২ মিগ্রাঃ। এবং ১০ ভাগ দূরে অবস্থিত হইলে (অর্থাৎ দণ্ডের প্রান্তে) ফলিত ভার ১ সেন্টিগ্রাঃ। আরোহীটীকে দণ্ডের উপর আবশ্যকমত ইতস্ততঃ সঞ্চালনের জন্য আবরণীর বহির্দ্দেশে একটী দণ্ড সংলগ্ন থাকে। আবরণীর মধ্যগত উক্ত দণ্ডটীর প্রান্তে একটী ক্ষুদ্রাকার অঙ্কুশ নির্ম্মিত থাকে। ইহার সাহায্যে আরোহীটীকে দণ্ড হইতে উত্তোলন করিয়া পুনরায় ইচ্ছামত যথাস্থানে রক্ষা করা যায়।

কোনও একটী বস্তুর ভার পরিমাণের সময় ৫০ গ্রাঃ, ১০গ্রাঃ, ২গ্রাঃ, ১গ্রাঃ, ২ডেগ্রাঃ, ১ ডেগ্রাঃ, ১ সেগ্রাঃ এই তুল কয়টী ব্যবহৃত হইল। আরোহীর অবস্থান ১১ বিভাগে হইলে পর নির্দ্দেশকটী, স্কেলে মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে সমান-ভাগ সঞ্চালিত হইয়া ভার সমতা নির্দ্দেশ করিল। এক্ষেত্রে বস্তুটীর ভার= ৬৩·৩১২১ গ্রাম।

উপরোক্ত তুল, কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সের মখমলের ভিতর অতিযত্নে রক্ষিত হয়। ব্যবহারের সময় হস্তস্পর্শে যাহাতে উহারা মলিন ও উহাদের ভার বৃদ্ধি না হয়, এইজন্য বাক্সের ভিতর একটী করিয়া চিমটা থাকে। এইরূপে সজ্জিত "ওজন বাক্স" তুলাযন্ত্রের একটী প্রধান উপকরণ।

তাপ-পরিমাপের জন্য তাপমান যন্ত্র নামক যন্ত্র-বিশেষের প্রচলন আছে। যন্ত্রটী পারদপূর্ণ একটী সূক্ষ্ম ও সরল কৌশিক ছিদ্র বিশিষ্ট কাচনল মাত্র। কাচনলটীর একপ্রান্তে বৃহত্তর পারদপূর্ণ আধার থাকে,

ও অপরপ্রান্ত বন্ধ করা হয়। পারদ একটী তরল ধাতু। যন্ত্রটীর আধার উত্তপ্ত হইলেই অভ্যন্তরস্থ পারদ উত্তপ্ত হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পায়; সুতরাং সূক্ষ্ম কৌশিক ছিদ্রের ভিতর পারদের প্রান্তরেখা অগ্রসর হইতে থাকে।

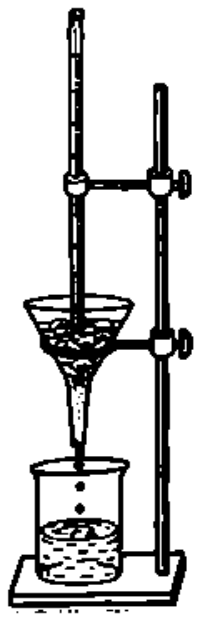

৫নং চিত্র।

প্রথমতঃ ত্রবধান বরফের ভিতর তাপমানের আধারটী রক্ষিত হয়। শৈত্য প্রযুক্ত আধারস্থ পারদ সঙ্কুচিত হয়, ফলে পারদরেখা আধারাভিমুখে অবতরণ করিয়া কৌশিক নলের কোনও একস্থানে অবশেষে স্থির হয়; সেই স্থানটীকে চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী উত্তাপকে "শূন্য ডিগ্রী" বলা হয় (৫নং চিত্র)

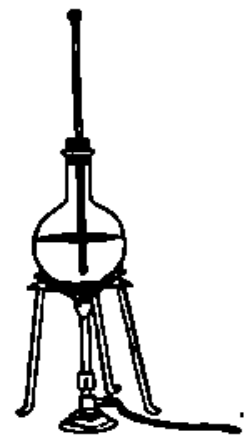

৬নং চিত্র।

পরে ফুটন্ত জল হইতে উদ্গত বাষ্পের ভিতর তাপমানের আধারটী রক্ষা করিলে পারদ-প্রান্ত অগ্রসর হইয়া নলের যে স্থানে স্থির হয়, সে স্থানটী (১০০°) একশত ডিগ্রী বলিয়া চিহ্নিত হইয়া থাকে (৬নং চিত্র)

পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়াছে যে, পারদের আয়তন বৃদ্ধি, উত্তাপ বৃদ্ধির সমানুপাতী। সুতরাং উপরোক্ত চিহ্ন দুইটীর ব্যবধান একশত সমান ভাগে বিভক্ত হইলে, প্রত্যেকটীর বিভাগ অনুযায়ী উত্তাপ এক ডিগ্রি হইয়া থাকে। বরফ অপেক্ষা শীতল বস্তুতে পারদাধার নিমজ্জিত হইলে পারদের রেখা 0 চিহ্ন অতিক্রম করিয়া আরও নিম্নে অবস্থান করে। এরূপক্ষেত্রে উত্তাপ, বিযুক্ত চিহ্নে প্রকাশিত হয়। 0° ও ১০০ মধ্যের চিহ্নানুক্রমে 0 র নিম্নে ও ১০০ র ঊর্দ্ধে কিছুদূর পর্য্যন্ত চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই প্রণালী তাপমান চিহ্ন করাকে "সেন্টিগ্রেড্" প্রথা বলে, ও ইহাই বিজ্ঞানালোচনায় সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইয়া থাকে।

অপর একটী প্রণালী, তাপমান যন্ত্রটীর পারদপ্রান্ত

বরফের উত্তাপে ৩২ ও ফুটন্ত জলের উত্তাপে ২১২° ধরা হইয়া থাকে। ইহা ফারেনহাইট প্রথা। উভয় চিহ্নের অবকাশ ১৮০ সমান ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক বিভাগানুযায়ী উত্তাপ=১ ফাঃ। নিশাদল ও বরফচূর্ণ সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া ইহাতে ফারেনহাইট তাপমানের আধার নিমজ্জিত করিলে পারদ প্রান্ত 0 ফাঃ প্রদর্শন করে। এইরূপ বহু আমাদের দৈহিক উত্তাপ ও বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ পরিমাপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরের সময় দৈহিক উত্তাপ ১০০ ফাঃ হইলে উহা সেন্টিগ্রেড প্রথায় (১০০-৩২) × ⅝=৩৭৮ সেঃ।

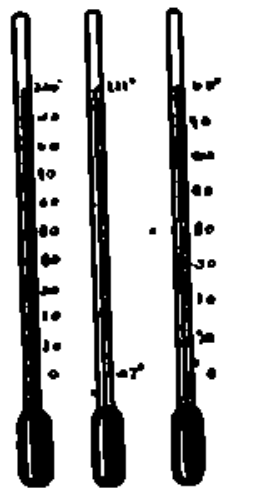

সেন্টিগ্রেড ফারেনহাইট রমুর

৭নং চিত্র।

নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক সাহায্যে একপ্রথার প্রকাশিত উত্তাপ অন্য প্রথায় নিরূপণ করা যাইবে :—

(ফাঃ − ৩২) × ⅝ = সেঃ
(সেঃ × ⅝) + ৩২ = ফাঃ

আরও একটী প্রথায় তাপ মাত্রা প্রকাশিত হয়; ইহাকে রমুর প্রথা বলে। হ্রবমান বরফের উত্তাপ 0 ও ফুটন্ত জলের উত্তাপ ৮০ ধরা হইয়া উহা চিহ্নের অবকাশ ৮০টী সমান ভাগে বিভক্ত হয়। এ প্রথা বর্ত্তমানে রাশিয়াতেই প্রচলিত।

একেত্রে রমুর × ⅘ = সেঃ (৭নং চিত্র)।

এক গ্রাম বিশুদ্ধ জলের উত্তাপ এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরিমাণ উচ্চতর করিতে হইলে উহাতে যে তাপ প্রয়োগ আবশ্যক, তাহার পরিমাণ "এক ক্যালোরী" ধরা হইয়া ইহাই তাপের পরিমাপক।

এক গ্রাম পরিমাণ যে কোনও বস্তুর উত্তাপ এক ডিগ্রী সেঃ পরিমাণ উচ্চতর করিতে হইলে যে তাপ শক্তির প্রয়োজন, তাহাকে বস্তুটীর "আপেক্ষিক তাপ" বলা হয়। সুতরাং জলের আপেক্ষিক তাপ=১

অতএব ১০ গ্রাম পরিমাণ কোনও বস্তুকে ২৫ সেঃ পরিমাণ উচ্চতর উত্তাপে আনয়ন করিতে, ১০ × ২৫ × (বস্তুটীর আপেক্ষিক তাপ) = ক ক্যালোরী পরিমিত তাপ শক্তির প্রয়োজন। সম আয়তন বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভারও বিভিন্ন সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট আয়তন জলের ভারের সহিত সম-আয়তনের বস্তুর ভার তুলনা করা হয়। এই অনুপাতই বস্তুটীর "গুরুত্ব"। জলের গুরুত্ব ১ ধরা হইলে এক সিসি ও আয়তন পদার্থের ভারই (গ্রাম) উহার গুরুত্ব। কঠিন ও তরল দ্রব্যের গুরুত্ব এই প্রথানুসারে নির্ণয়িত হইয়া থাকে। বায়বীয় অবস্থায় উদ্‌জান নামক লঘুতম গ্যাসের ভার উক্ত প্রকারে তুলনা মূলক ধরা হয়

[৩]

দ্রব্যমাত্রেই উত্তাপ, চাপ প্রভৃতি বাহ্যিক অবস্থানুযায়ী ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিতে সক্ষম :— কঠিন, তরল ও বায়বীয় বা গ্যাস।

কঠিন রূপে দ্রব্যটীর নির্দ্দিষ্ট একটী আকৃতি থাকে ইহা সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না। দ্রব্যটীকে যে স্থানে রক্ষা করা হয়, সেই স্থানেই উহা স্থির ভাবে

অধিকার করিয়া থাকে। অল্পায়াসে ইহার আয়তন বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

তরল রূপে দ্রব্যের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি থাকে না। যে আধারে উহা রক্ষিত হয়, দ্রব্যটী সেই আধারের আকৃতি গ্রহণ করে। আধার বর্জ্জিত তরল দ্রব্যকে বাহিরে মধ্যাকর্ষণের ফলে উহা নিম্নতল অভিমুখে প্রবাহিত হয়। তরল দ্রব্যকে অল্পায়াসেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু চাপপ্রয়োগে উহার আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি সংঘটন করা যায় না।

তরল দ্রব্যের উপরি ভাগ মধ্যাকর্ষণেরই ফলে সর্ব্বদা সমতল গত থাকে।

কঠিন দ্রব্যকে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিলে ইহাও কতকাংশ তরল দ্রব্যের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। আধার অনুযায়ী ইহারও আকৃতি ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার উপরিভাগ সমতল গত না হইতেও পারে। আধার বর্জ্জিতও চূর্ণ রক্ষিত হইতে পারে। অনুবীক্ষণ-যোগে তরল পদার্থের কণিকা পৃথক পৃথক দেখা যায় না; কিন্তু চূর্ণের কণিকা সহজেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বায়বা রূপেও দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট আকৃতি থাকে না। আধার অনুযায়ী উহার আকৃতিভেদ হইয়া থাকে। গ্যাসের বিশেষত্ব ইহাই যে, যে কোন পরিমাণ দ্রব্যকে যে কোনও আয়তন বিশিষ্ট আধারে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ অতি অল্পায়াসেই ইহার আয়তন পরিবর্ত্তিত করা যায়। অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস অতি বৃহৎ পাত্রে আবদ্ধ করিলেও উহা পাত্রটীকে পূর্ণ করিয়া থাকে।

জলের কঠিনরূপ "বরফ" তরলরূপ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য পানীয় ও প্রক্ষালনীয় "জল" ও বায়ব্য-রূপ "জলবাষ্প"। জলকে ০° সেঃ উত্তাপে আনয়ন করিলে উহা বরফে পরিণত হয় ও ১০০ সেঃ উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে।

[৪]

সকল দ্রব্যই স্থূল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ছিদ্রময়; অসংখ্য সূক্ষ্ম ও পরস্পর সংলগ্ন কণিকার সমষ্টি মাত্র। একটী পাত্র বালুকাপূর্ণ করিলেও তাহার ভিতর প্রচুর জল রক্ষা করা সম্ভব। সংলগ্ন বালুকা কণার অবকাশে এই জল প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। দ্রব্যমাত্রেরই সংলগ্ন কণিকার মধ্যে উক্তরূপ অবকাশ আছে।

দ্রব্যের কণিকা-পরম্পরের ভিতর দুইটী বিভিন্ন শক্তির প্রভাব বর্ত্তমান। একটী আকর্ষণী ও অপরটী বিকর্ষণী শক্তি। আকর্ষণী শক্তি কণিকাগণকে পর-স্পরের সহিত সংলগ্ন করিবার প্রয়াস পায় ও বিকর্ষণী শক্তি উহাদের পরস্পর হইতে দূরে বিক্ষেপের চেষ্টা করে এই পরস্পর বিরোধী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রাধান্য অনুসারে দ্রব্যটীর রূপভেদ হইয়া থাকে।

কঠিন অবস্থায়, আকর্ষণী শক্তির প্রাধান্য বশতঃ দ্রব্য কণিকা পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এবং তরল অবস্থায় উভয় শক্তির সমতা প্রযুক্ত সংলগ্ন কণিকাগণ অল্পায়াসেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। কণিকা-পরস্পরে দৃঢ়-বন্ধন না থাকায় তরল দ্রব্য স্বতন্ত্র আকৃতি গ্রহণে অসমর্থ। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিবার উপযুক্ত আকর্ষণী শক্তির অভাবে, আধারস্থ তরল দ্রব্যের কণিকাগণ পৃথিবীকেন্দ্রের সমদূরবর্ত্তী লক্ষিত হয়— অর্থাৎ তরলদ্রব্যের উপরিভাগ সর্ব্বদাই সমতলবর্ত্তী থাকে। উক্তরূপ কারণেই তরলদ্রব্য নিম্নতলাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। দ্রব্যের বায়ব্যরূপে কণিকার বিকর্ষণীশক্তি প্রবলতর। সুতরাং কণিকাগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আধারের গাত্রে প্রতিহত হয়। রবার নির্ম্মিত "বলের" ন্যায় আঘাতের পর কণিকা প্রতিক্ষিপ্ত হয়, এবং বিকর্ষণীশক্তি প্রভাবে পুনরায়

আধারপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বায়বা কণিকাগণের আধারসীমা অতিক্রম করার প্রয়াস ফলে গ্যাসের ভিতর "চাপের" সৃষ্টি হয়। চাপের পরিমাণ, আধার গাত্রে এক সেকেণ্ড কণিকার ঘাত প্রতিঘাতের সংখ্যার সানুপাতিক। আধারের আয়তন যত ক্ষুদ্র হইবে কণিকাগণের আঘাত প্রতি সেকেণ্ডে ততই অধিকবার হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়; এবং আধারের আয়তন বর্দ্ধিত করিলে আঘাত মন্দীভূত হওয়ায় চাপের হ্রাস হইবে। উক্ত পরিবর্ত্তন নিম্নলিখিত সঙ্কেতানুযায়ী সংঘটিত হইয়া থাকে।

বয়েলের সূত্র

মূল আয়তন × মূলচাপ = পরিবর্ত্তিত চাপ × পরিবর্ত্তিত আয়তন ·····(১)

সূত্রটী "বয়েলের সূত্র" নামে পরিচিত।

উত্তাপবৃদ্ধির সহিত গ্যাসের কণিকার বিকর্ষণী শক্তিও বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং কঠিন দ্রব্যে তাপ প্রদান করিতে থাকিলে বিকর্ষণী শক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে ক্রমে আকর্ষণী শক্তির সমান হয়। তখন দ্রব্যটী তরল রূপ ধারণ করে। উত্তাপ ক্রমে আরও উচ্চতর করিতে থাকিলে বিকর্ষণীশক্তি, আকর্ষণী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া কণিকাগুলিকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। এই সময় দ্রব্যটী বায়বা বা গ্যাসরূপ গ্রহণ করে। কর্পূর প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন দ্রব্যে তাপ প্রদান করিলে কণিকার বিকর্ষণীশক্তি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইয়া আকর্ষণী শক্তিকে অতিক্রম করে, ও দ্রব্যটী কঠিনরূপ হইতে একেবারে বাষ্পাকার প্রাপ্ত হয়। এমোনিয়ম্ ক্লোরাইড, পারদ দ্বি ক্লোরাইড, আয়োডিন ইত্যাদি অনেক দ্রব্য উক্ত ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া থাকে।

একটী আধারবদ্ধ গ্যাসে তাপ প্রদান করিলে কণিকার বিকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধির জন্য গ্যাসের চাপের ও বৃদ্ধি হয়। ইহা নিম্নলিখিত সঙ্কেতানুক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে।

$$\text{পরিবর্ত্তিত চাপ} = \text{মূলচাপ} \times \left(1 + \frac{\text{উত্তাপবৃদ্ধি}}{২৭৩}\right)$$

উপরোক্ত সাঙ্কেতিক সূত্রটী (১) ও (২) একত্রে নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশিত হইতে পারে :—

$$\frac{\text{মূল আয়তন} \times \text{মূল চাপ}}{২৭৩ + \text{মূল উত্তাপ}} = \frac{\text{পরিবর্ত্তিত আয়তন} \times \text{পরিবর্ত্তিত চাপ}}{২৭৩ + \text{পরিবর্ত্তিত উত্তাপ}}$$

এই সূত্রের সাহায্যে চাপ, উত্তাপ ও আয়তন এই তিনটী পরিমাণ, পরস্পরের পরিবর্ত্তনের ফলে কি ঘটিল তাহা নিরূপণ করা যায়। পদার্থ বিজ্ঞান সাহায্যে, পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়াছে যে একটী নির্দ্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসে তাপ প্রদান করিয়া উহার উত্তাপ ১° সেঃ পরিমান উচ্চতর করিলে উহা আয়তনের ১/২৭৩ অংশ পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের চাপ গ্যাসের চাপ পরিমাপক। এই পরিমাণ চাপকে এক "বায়ু" (atmosphere) বলে। ইহার পরিমাণ এক বর্গ সেঃ মিঃ ক্ষেত্রের উপর ১০৩৩·৬ গ্রাম ভারের সমান। পরিমাণ সাগর জল হইতে স্থানটীর উচ্চতার উপর কতকাংশে নির্ভর করে।

চাপ পরিমাণের জন্য "চাপমান" যন্ত্র প্রচলিত আছে। ইহার গঠন প্রণালী এইরূপ :—একটি এক-প্রান্ত বন্ধপ্রায় একগজ দীর্ঘ কাচনল পারদপূর্ণ করা হয়। ইহার পরে মুখটী অবরুদ্ধ করিয়া উহা অপর একটী বৃহত্তর পারদপূর্ণ আধারে নিম্নমুখে রক্ষিত হইয়া থাকে। একণে নলটীর মুখ উন্মুক্ত করিলে পারদ নলের ভিতর কিছু নিম্নে আসিয়া স্থির হয়। মূল আধারটীর পারদ সীমা হইতে উক্তনলের পারদ সীমার উচ্চতা, যন্ত্রটীর চতুঃপার্শ্বস্থ গ্যাসের চাপের পরিমাপক। বায়ু মণ্ডলে উক্ত পরীক্ষা সম্পাদিত হইলে উচ্চতার

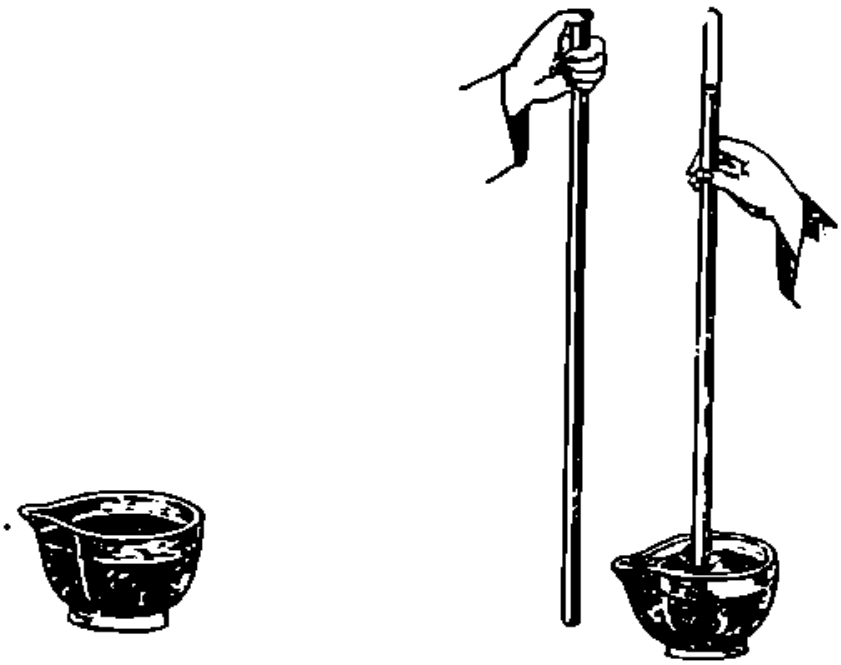

২ক চিত্র।

পরিমাণ সমুদ্রতটে ইহার পরিমাণ ৭৬০ মিমি:

নলটীর ক্ষেত্রচ্ছেদ এক বর্গ সেমি: ধার্য্য হইলে পারদ স্তম্ভটীর ভার নির্দ্ধারণ করা যাইবে। বলা বাহুল্য সে নলটীর ব্যাস ও ক্ষেত্রচ্ছেদ যাহাই হউক পারদ স্তম্ভের উচ্চতা স্থান বিশেষে একই পরিমাণ হইবে। পারদের ঘনত্ব ১৩·৬ অর্থাৎ এক ঘন: পারদের ভার ১৩·৬ গ্রাম। উপরোক্ত পারদ স্তম্ভের আয়তন ১ × ৭৬ ঘন: সে: সুতরাং পারদভার ১ × ৭৬ × ১৩·৬ = ১০৩৩·৬ গ্রাম। সমুদ্র তটের বায়ু চাপ ৭৬ সেমি: অথবা ৭৬০ মি: মি:) বিজ্ঞানে আলোচনার জন্য চাপের "সাধারণ অবস্থা" বলিয়া উল্লিখিত হয়। সমুদ্রতট হইতে যত উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু চাপও তত নিম্নতর হইয়া থাকে। ইহা সবিশেষ বায়ুপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

১০০ সিসি আয়তনের কিছু গ্যাস ৭৪৭ মিমি: চাপেও ৩২ সে: উত্তাপ আছে। উহা "সাধারণ অবস্থায়" অর্থাৎ ৭৬০ মিমি: চাপে ও ০° উত্তাপে যে আয়তন গ্রহণ করিবে তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে নিরূপিত হইবে :—

$$\frac{১০০ \times ৭৪৭}{২৭৩+৩২} =$$

$$\frac{\text{পরিবর্ত্তিত আয়তন} \times ৭৬০}{২৭৩+০^{\circ}}$$

সুতরাং পরিবর্ত্তিত আয়তন

$$\frac{১০০ \times ৭৪৭}{২৭৩+৩২} \times \frac{২৭৩}{৭৬০} = ৮৯·৪ \text{ সিসি।}$$

[৫]

জল, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে বিভিন্ন উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট একাধিক দ্রব্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত দ্রব্যগুলের ধর্ম মূল দ্রব্যগুলের (জল বা লবণ ইত্যাদির) ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জল হইতে "উদ্‌জান" ও "অম্লজান" নামক দুইটী গ্যাস পাওয়া যায়। লবণ হইতে "সোডিয়ম্" নামক ধাতু ও "ক্লোরিণ" নামক গ্যাস পাওয়া যায়। জল, লবণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর দ্রব্যকে "যৌগিক দ্রব্য" বলা হয়।

যে সকল দ্রব্য হইতে কোনওরূপ প্রক্রিয়া সাহায্যে ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট অপর দ্রব্য বিশ্লেষণ করা যায় না, সেই সকল দ্রব্যকে "মৌলিক দ্রব্য" বলে।

যৌগিক দ্রব্য, দুই বা ততোধিক মৌলিক দ্রব্যের সংযোগ ফল। বিজ্ঞানে প্রায় ৮০টী মৌলিক দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুপরিচিতের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মৌলিক দ্রব্যের একটী করিয়া সঙ্কেত চিহ্ন ধার্য্য হইয়াছে। সাধারণতঃ দ্রব্যটীর ল্যাটীন নামের আদ্যাক্ষর এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে তালিকার প্রত্যেকটী দ্রব্যের সঙ্কেত চিহ্নের পার্শ্বে একটী করিয়া সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দ্রব্যগুলি পরস্পরের সহিত উক্ত সংখ্যার অনুপাতে সংযুক্ত হয়। এই সংখ্যার নাম " সংযোগ ভার"

দ্রব্য	সঙ্কেত	সংযোগ ভার
এলুমিনিয়ম	Al	২৭
এন্টিমনি	Sb	১২০
আর্সেনিক	As	৭৫
বেরিয়ম্	Ba	১৩৭
বিস্মথ্	Bi	২১০
বোরণ	B	১১
ব্রোমিন	Br	৮০
ক্যাড্‌মিয়ম্	Cd	১১২
ক্যাল্‌সিয়ম	Ca	৪০
কার্বন (অঙ্গার)	C	১২
ক্লোরিণ	Cl	৩৫·৫
ক্রোমিয়ম্	Cr	৫২
কোবাল্ট	Co	৫৯
তাম্র	Cu	৬৩·৫
ফ্লোরিণ	F	১৯
স্বর্ণ	Au	১৯৭
উদ্‌জান	H	১·০৮
আয়োডিন্	I	১২৭
লৌহ	Fe	৫৬
শীসক	Pb	২০৭
ম্যাগনেসিয়াম	Mg	২৪
ম্যাঙ্গানীজ্	Mn	৫৫
পারদ	Hg	২০০
নিকেল	Ni	৫৮·৭
নাইট্রোজেন		১৪
অম্লজান		১৬
ফস্ফরস্		৩১
প্ল্যাটিনম্		১৯৫
পটাশিয়াম		৩৯
সিলিকন্		২৮
রৌপ্য		১০৮
সোডিয়ম্		২৩
গন্ধক		৩২
টিন (রাং)		১১৯
দস্তা		৬৫·৫

সেবাপথে পূর্ত্ত শিল্প

[চতুর্থ দে]

নগরে আধুনিক সভ্যতানুমোদিত জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদি গঠনে নাগরিকের সেবাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপ কোনও গঠনের যুক্তিযুক্ততা বিচারে, উহাতে পূর্ত্তবিদের উৎকর্ষতার পরিচয় যেমন বিবেচ্য, গঠনটীর সহায়তায় মূল উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও তেমনই বিচার্য্য। উহার পরিকল্পনা বিজ্ঞান ঘটিত সূত্রাদি সম্মত হওয়া অবশ্যই উচিত—কিন্তু ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এই সকল সূত্রাদির কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োগ প্রকৃতই সম্ভবপর। গঠনের উপকরণাদি যথোপযুক্ত হইবে এবং গঠনকার্য্যও প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ব্যয়ের অনুপাতে সাধারণের শ্রম লাঘবের উপায়, বা স্বাস্থ্যের আনুকূল্য বা অন্য কোনরূপ উপকার সৃষ্টি হইতেছে কি না। একটী রাজধানী অট্টালিকা হইতে উহাকে সুশৃঙ্খলে রক্ষা করিবার উপযোগী আয় যদি না উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে এরূপ গঠন সমর্থন যোগ্য নহে। কিন্তু নগরের নিকাশ-প্রণালী হইতে প্রত্যক্ষ অর্থাগম না হইলেও নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের আনুকূল্য সাধনে এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমর্থনীয়।

সাধারণতঃ কোনও একটী গঠনের পরিকল্পনার সময় উহার সহায়তায় অর্থাগমের পরিমাণই বিবেচনা করা হয়—কারণ ব্যবসার হিসাবেই এরূপ গঠনকার্য্য সচরাচর হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারণের অর্থে জনসাধারণের সুবিধার উদ্দেশ্যে যে সকল গঠন পরিকল্পিত হয়, তাহাতে অর্থাগম গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। এই জাতীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রত্যক্ষ অর্থাগম সামান্য মাত্রে হইয়া থাকে; কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রতিদান ব্যয়ের অনুপাতে হওয়া কর্ত্তব্য।

যে সকল গঠ-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রত্যক্ষভাবে অর্থাগম হয় না—বা অর্থাগম ব্যয়ের অনুপাতে অকিঞ্চিৎকর, তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাজপথ। কিন্তু সুগঠিত রাজপথের কার্য্যকারীতা প্রস্ফুটিত হয় পথচারী ও যানবাহনাদির শ্রম ও ব্যয়লাঘবে, সময় সংক্ষেপে এবং ব্যাবসাবাণিজ্য ও সামাজিক সম্মিলনাদির আনুকূল্যে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের বিচারে দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। কোনও ব্যবসায় ঘটিত প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বিচারে যেরূপ মুনাফাই যথেষ্ট, তাহা উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু যাহাই হউক, সকল ক্ষেত্রেই প্রতিদান ব্যয়ের অনুযায়ী হওয়া উচিত—তাহা অর্থরূপেই হউক বা নানাপ্রকারে মূল স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের আকারেই হউক।

এতদিন এই মূল তথ্যটী যথোপযুক্ত রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিলে কলিকাতা নগরীর বহু স্থাপত্য সমস্যা অধিকাংশের উদয়ই হইত না। কিন্তু এতাবৎ স্থপতি বিভাগে ব্যাখ্যাদিকা ঘটিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে অর্থাগমের প্রয়াস করা উচিত নহে কি? অন্ততঃ যাহাতে এই সকল বিভাগের আয় ও ব্যয় যথাসম্ভব সমান হয় তাহার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?

এ ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রয়োজন নিয়োগের উপযোগী শক্তির উৎপাদনই প্রথম লক্ষ্য বোধ হয়। কলিকাতার প্রায় সমতল স্থানে নাগরিকের ব্যবহার্য্য জল আহরণ ও সরবরাহ, উভয় উদ্দেশ্যেই শক্তি নিয়োগ আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত নগর আলোকিত করিবার জন্য,

নানা প্রকার যান-বাহনাদির জন্য ও অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনে শক্তি-নিয়োগ অপরিহার্য্য। সুতরাং কলিকাতা কর্পোরেশনের সকল প্রকার প্রয়োজনের উপযোগী শক্তি একস্থানে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে কর্পোরেশনের ব্যয় লাঘব অবশ্যম্ভাবী; উপরন্তু ইহাকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে বিপুল অর্থাগমের উপযোগী একটী সুবৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর।

নগরের আবর্জ্জনার যথোপযুক্ত ব্যবহারে আবর্জ্জনা বিভাগে এরূপ অর্থাগম হইতে পারে যে উহা স্বকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার পরও অন্যান্য নানা জনমূলক বিভাগে অর্থসাহায্য করিতে সক্ষম হইবে। আবর্জ্জনা বিনাশের স্বাস্থ্য-সঙ্গত উপায় উহাকে দহন করা। এই দহনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে, দহনোৎপন্ন শক্তি নিয়োগে নগরের নানা স্থান হইতে দহনস্থান পর্য্যন্ত আবর্জ্জনা বহনের কার্য্যও নির্ব্বাহ হইতে পারে। কলিকাতার জল পরিষ্করণের সময় উহা হইতে যে কর্দ্দম নির্গত হয়, তাহা ইষ্টকনির্ম্মাণে নিয়োগ করিলে আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় হইতে পারে। কর্পোরেশনের যন্ত্র কর্ম্মশালা ক্রমশঃ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের উপযোগী করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ভবিষ্যতে সামান্য একটী পাম্প বা এঞ্জিনের জন্য আর নিঃসোচ্চ ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

এইরূপ নানাবিধ আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান সমষ্টি হইতে শিক্ষা-বিস্তারে, স্বাস্থ্য রক্ষা বিধানে, রোগীর জন্য ঔষধ পথ্য, ইত্যাদি নানারূপে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিয়োগের উপযুক্ত অর্থাগম হইতে পারে এই পথে চলিলে একদিন কলিকাতার প্রথম মেয়র দেশবন্ধুর স্বপ্ন সফল হইবে।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

শ্রীযুক্ত সুনীল কৃষ্ণ রায় চৌধুরী

যাঁহারা স্যার অলিভার লজের আধুনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই হয়ত বলিতে পারিবেন কিরূপে তিনি বিজ্ঞানের চরম জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের প্রবেশ দ্বারে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যে শুধু জন্মান্তর বাদ মানেন তাহাই নহে, উপনিষদ্ পাঠ না করিয়াই উপনিষদের অনেক বিষয় তিনি তাঁহার নিজ অনুভূতি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তবুও মনে হয় তাঁহার অবস্থা অনেকটা "ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি—।" এই রূপেই, উপনিষদের ঋষিগণ সরল সাধনা ও অসাধারণ তপস্যা করিয়া জীব, জগৎ ও ভগবানের চরম-জ্ঞানের অনুভূতি লাভ করিয়া যে জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁহারা মনুষ্য জাতির অসীম আনন্দের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, যদি কেহ সেই জ্ঞান ভাণ্ডার স্যার অলিভার লজ্ ও ঐরূপ উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিকগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিতেন তাহা হইলে এইসকল মহাপ্রবণ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের জড়বিজ্ঞানে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারিতেন।

আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের ও যন্ত্রশিল্পি হেনরী ফোর্ডের দর্শন (Phylosophy) যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারা স্পষ্টই

বুঝিতে পারিবেন যে তিনি যে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা ও ব্যবসা চালাইয়াছেন ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার এই কর্ম্মজীবনের উৎস কোন খানে। তিনি তাঁহার লিখিত "My Philosophy" আমার দর্শন নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন (খুব সম্ভব "গীতা" পাঠে) যে মানুষের জীবন অনন্ত এবং তুচ্ছ ভস্মাকর শরিরঃ ভাগবান পুরুষেরা এই ধরার ধন, ঐশ্বর্য ও সুখরাজী সম্ভোগ করেন, তখন তিনি ৫০ বৎসর বয়সে নিজ কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত করেন। অথচ আমাদের দেশের প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া ও ৪০ বৎসর বয়সেই লোকান্তর প্রাপ্তির আশায় বিবিধ পারলৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকেন। এই তথাকথিত জড়বিজ্ঞান-বাদীর কারখানায় এখন যন্ত্র অপেক্ষা মানুষের দরদ বেশী। কারণ তাহারা বিজ্ঞান ও যন্ত্র শিল্পের চরম জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া চণ্ডীদাসের "সবার উপরে মানুষ সত্য—" এই উক্তির প্রমাণ পাইয়াছেন।

আজ আমাদের পুণ্যভূমি ধর্ম্মের রাজ্যে এত অধর্ম্ম, অশান্তি ও অপকর্ম্ম বিরাজমান কেন তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম আজ সারা জগতের বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ সমরে আহ্বান করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ, সেই ধর্ম্মের দেশে অধর্ম্মের তাণ্ডবলীলা কিরূপে সম্ভবপর হইল তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ইহার প্রধান ও অন্যতম কারণ আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানের বিশেষ অভাব আছে বলিয়াই। যদিও পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাল্যে ও কৈশোরে সাধনা না করিয়াই ভগবদ্দর্শনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তথাপি সিদ্ধিলাভের পরেও তাঁহাকে পর্য্যায়ক্রমে সকল রকম সাধনার প্রত্যেক স্তর একে একে বিবিধ গুরুর সাহায্যে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এরূপ ভগবদ্দর্শন সকল জাতির বিশিষ্ট মানবের মধ্যে হইয়াও থাকে ও হওয়াও দরকার। কিন্তু ইহার গূঢ় তত্ত্বগুলি আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে ও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে এই ভাবগুলি ওতপ্রোত ভাবে মিলিত আছে বলিয়াই ইহা আমাদের পক্ষে যেরূপ সহজসাধ্য অন্য কাহারও পক্ষে সেরূপ নহে। কিন্তু যাহা আবার ইহাদের ন্যায় মহদ্ব্যক্তিগণের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল জন সাধারণের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের শাস্ত্রে আছে যাহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে তিনি জগতের সব জ্ঞানই লাভ করেন। কিন্তু এই চৈতন্যের কথা লইয়াই হয় যত গণ্ডগোল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড়বিজ্ঞান বাদী। তাঁহাদের অনেকেই এই জড়বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ বিলীন হইয়াছে সেই সীমা পর্য্যন্ত অতি সুন্দর ভাবেই পৌঁছিয়াছেন কিন্তু তাহার পর চৈতন্য রাজ্যের প্রারম্ভেই তাঁহাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায় ও তাঁহারা একেবারে অন্ধকার দেখেন। অবশ্য দুই একজন বৈজ্ঞানিক এই চৈতন্যরাজ্যে অল্পক্ষণের জন্য হয়ত পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের সকলের জ্ঞান আরম্ভ হয় এই চৈতন্য রাজ্য হইতে। সেই জন্য কোন গুরুই তাঁহার শিষ্যগণকে আর জড় রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে দেন না। আর সেই কারণেই জড় বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের করতলগত হইয়াও ব্যবহারিক জগতে কোন রূপেই কার্য্যকরী হইতেছে না। আমরা জানি, জগতের বাহ্যমণ্ডলের জ্ঞান অথবা তদপেক্ষাও আমাদের এই ধর্ম্ম অজর, অমর ও সত্য। হয়ত বা সকল মনুষ্যজাতি বিনষ্ট হইতে পারে তথাপি ইহার বিনাশ নাই।

যদি কখনও এই ধর্ম (যেরূপ ভাবে ইহা এখন প্রচলিত আছে) লোপ পায়, তাহা হইলে মানব জাতিকে অসীম ক্লেশ ও অনন্ত তপস্যাদ্বারা ইহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু এই ধর্ম ও উপনিষদের জ্ঞান বিস্তার করিয়া জগতের সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দ বৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতবাসীকে আজ বিজ্ঞানের জ্ঞান বলে বলীয়ান হইতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধিবাদী, সংশয়বাদী ও ইহাদের অনুসরণকারীগণকে অতি সহজেই ও সুনিশ্চিতরূপে আধিক ও পরমার্থিক জগতের প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করাইয়া জড়বিজ্ঞানের দম্ভ দিয়া অতি বিজ্ঞান সম্মত উপায়েই চৈতন্য রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন।

আধিক ও পরমার্থিক উভয় জগতেই নিজেদের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের পূর্ব্বতন রাসায়নিক, পদার্থবিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞানে (যাহার অধিকাংশ এক্ষণে কেবল মাত্র সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে ও যাহার উদ্ধার সাধন ও নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া জার্ম্মানগণ মকরধ্বজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন) ও আধুনিক বিজ্ঞানে আমাদিগের দেশের জনসাধারণকে পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে দেশ ধনশালী, স্বাস্থ্য সম্পন্ন, কুসংস্কারশূন্য ও প্রকৃত রূপে ধর্ম্মময় হইয়া সদানন্দ ধামে পরিণত হইবে। ইহা করিতে হইলে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান গ্রন্থ সমূহের স্থলে আমাদের মাতৃ ভাষায় পুস্তক সকল সঙ্কলিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই বিজ্ঞানের জ্ঞান দানের প্রারম্ভ ক্ষেত্রে হওয়া আবশ্যক এবং এই বাংলা ভাষাতেই উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সকল প্রচার ও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

আজ এক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বৃক্ষের প্রাণের স্পন্দন ও তাহার অনুভব শক্তি আছে তাহা পুনঃ প্রমাণ করিয়া ও অন্যান্য কয়েকটী বিজ্ঞানের অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু দেশের জিলায় জিলায় এমন কি প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ দুইচারটী 'বসু' মহাশয় ও 'রায়' মহাশয়গণের জন্মগ্রহণ করা প্রয়োজন। আর তাহা সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞানের সৃষ্টি হওয়া চাই। সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আজ বঙ্গীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে।

যাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্যাপকভাবে মাতৃ ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রসার লাভ করিলে দেশে কী এক অভিনব পরিবর্তন সাধিত হইবে। তখন আমরা যে কেবল আমেরিকা বা তদপেক্ষাও ক্ষমতাবান ও ধনশালী জাতি হইতে পারিব শুধু তাহাই নহে; এই জাতির শোণিতে যে জীবনীশক্তি ধর্ম্মের দ্বারা পুষ্ট হইয়া শত সহস্র কল্প ও আর্য্যাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া উচ্চশিরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার মনুষ্যত্বের দাবী জগতের নিকট জানাইতে চাহে তদ্দ্বারা আমরা এই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সম্মুখে একটী আদর্শ জাতির আলেখ্য উপস্থাপিত করিতে পারিব। দেশের শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য নাশ করিতে না পারিলে পার্থিব বা স্বর্গীয় কোন সুখ বা আনন্দ সেখানে থাকিতে পারে না। দেশের মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য্য না থাকিলে ধর্ম্ম সেখানে অধিক দিন অবস্থান করিতে পারে না। আর দেশে সেই অবস্থা আনয়ন করিতে হইলে আমাদের সকল প্রকার বিজ্ঞানের জ্ঞান

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে সামান্য সামান্য অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত আমাদিগকে সহরের দিকে ছুটিতে হইবে না বা সহরবাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না। প্রত্যেক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সহিত একটী করিয়া রসায়ন, পদার্থ ও তড়িৎ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার ও তৎসহ একটী করিয়া ক্ষুদ্র ও সুসজ্জিত শিল্পাগার থাকিলে প্রত্যেক গ্রাম স্বাধীনভাবে নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে রত থাকিতে পারিবে।

নামের নীতি

অধ্যাপক হেমন্তকুমার সেন

পরিচয় প্রদান করিবার জন্য সকল বস্তুরই একটী না একটী নামের প্রয়োজন। নদ, নদী, পর্ব্বত, নগর, মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ প্রভৃতি সকল বস্তুরই পরিচয় প্রকাশক একটী না একটি সংজ্ঞা থাকে। শুধু যে আমাদের দেশেই আছে তাহা নহে, সকল দেশেই আছে। তবে, বিশেষত্বের মধ্যে ইহাই দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে কোনও বস্তুরই নিরর্থক সংজ্ঞা দেওয়া হয় না।

নামের দ্বারা মাতৃভাষার অর্থাৎ জাতীয় উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করা এ দেশের সনাতনী প্রথা। নামকরণ মাতৃভাষার সাহায্যে হওয়াই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিগণ যে ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের নামগুলিতে সত্যার্থ প্রকাশক একটি না একটি পুণ্যস্মৃতি, একটি না একটি অর্থব্যঞ্জক মহাশক্তি নিহিত আছেই আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে ঠিক সেরূপ পরিদৃষ্ট হয় না।

সকল বস্তুরই শেষ অবলম্বন স্মৃতি। সে স্মৃতি নামেতেই রক্ষিত। একটি পুষ্করিণীর তীরে তালবৃক্ষ না থাকা সত্ত্বেও তাহার নাম—তালপুকুর। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, ইহার তীরে কোনও এক সময়ে তালবৃক্ষ নিশ্চয় বিদ্যমান ছিল; পুষ্করিণীর নামই তাহার সত্যতা রক্ষা করিতেছে।

"পোট্রোগ্রাড্" নগরের নাম "ওয়ার্শ" (Warsaw) হওয়া সম্ভব অথবা সেন্সরের বশে বা প্রয়োজনানুরোধে মিসিসিপি নদীটি হুইস্‌কিক্যাস্ বা আর্‌বিট্রেরি নামে পরিচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সুবর্ণরেখা নদীটির নাম হিলিবিলি বা অন্যরূপ হইবার যো নাই, কারণ ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ভূতত্ত্ববিদ্ ও ধনিতত্ত্ববিদ্‌গণ উক্ত নদীর বালুকাকণার সহিত সুবর্ণরেণু প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ঔঁহারা বহুপূর্ব্বে অবগত হইয়াই নদীটির নাম সুবর্ণরেখা রাখিয়াছিলেন। দেশের সমুদয় গ্রন্থ, সমুদয় পাঠাগার চিরবিনষ্ট হইলেও, দেশের ভাষা যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন দেশবাসীর হৃদয়ে নদীটির যশোমর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ হইবে।

বরাকর একটী নদীর নাম। ইহার নাম ক্ষুদ্রাকর বা অন্য একটা কিছু হইল না। "বর" অর্থে শ্রেষ্ঠ, "আকর" অর্থে খনি। দেখিতে পাই, বরাকর নদী যেখানে প্রবাহিত, সে সমুদায় ভূখণ্ডও শ্রেষ্ঠ

খনিজ পদার্থ কয়লাস্তর ও লৌহস্তরের সহিত সংযুক্ত। কয়লা ও লৌহ এই দুইটি বস্তুকে শ্রেষ্ঠ খনিজ পদার্থ বলিবার তাৎপর্য্যও আমরা বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাই যে, কয়লার খনি বন্ধ হইলে, রেলগাড়ী, জাহাজ, কল, কারখানা প্রভৃতির কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং এক কয়লাখনির স্তরা-স্তরের উপর অনেকগুলি বৃহৎ ব্যাপার নির্ভর করিতেছে। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ অথবা ঐ জাতীয় লৌহ শিল্পের জন্য খনি হইতে কয়লা উত্তোলন ও তৎসাহায্যে বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত করণ এ দেশে প্রাচীনযুগে সম্ভবপর ছিল কি না, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যে সহজেই প্রতিপাদিত হয়। কয়লা ও লৌহের ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তা না জানিয়া নদীটির এবম্প্রকার নামকরণ কখনই সম্ভব নহে। বরাকর নামের সার্থকতা আছে বই কি! তাই, ভাবের কবি দ্বিজেন্দ্র লালের প্রাণের উচ্ছ্বাস,—

"ধন ধিরে তৈরী এ দেশ স্মৃতি দিরে ঘেরা"।

যে বস্তুটিতে যে প্রকার স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে, সে বস্তুটির নামও তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ-প্রকাশক ও যথার্থ-গুণ-পরিচায়ক করিয়াই রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত থাকায় স্থানে স্থানে নামগুলি বিভিন্ন ভাষায় রচিত। অপর পক্ষে, নানা বিদেশীয়ের আগমনে, নামগুলি অনেক অবস্থায় বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যথা,—ঈশ্বরের ইংরাজী প্রতিবাক্য "গড্" অথবা মানুষের ইংরাজী "ম্যান্" এর ন্যায়, গঙ্গার ইংরাজী "গাঙ্গেস্", কলিকাতার ইংরাজী "ক্যাল্‌কাটা," চট্টগ্রামের ইংরাজী "চিটাগং", শঙ্খকোট পর্ব্বতের নাম "সেচিটিস্" অথবা "স্যাফেট্রস্," বারাণসীর ইংরাজী "বেনারেস্," হইতে পারে না, হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু হইয়াছে। নামের এবম্প্রকার বিকৃতি প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত শত সহস্র বর্ত্তমান। অন্যান্য দেশের বিশেষত্ব এই যে, সে দেশের নামগুলি অর্থশূন্য হইলেও, সেগুলি শুদ্ধ-স্বরূপে পূর্ণাবয়বে বর্ত্তমান।

নামগুলির বিকৃত হওয়ায় আমাদের যে কতখানি ক্ষতি হইতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়, উপেক্ষার সামগ্রী নহে। মানভূম একটী জেলার নাম। ইহার নাম অযোগ্য বা অবিহিত হইল না, কারণ এখানকার মাটিতে (মাণিকভূমি) মান অর্থাৎ খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান। এইরূপ বীরভূম একটি জেলার নাম। যে দেশের অধিবাসীগণ বীরত্বের অনুশীলন করিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের শৌর্য্য, বীর্য্যের স্মৃতি এখনও তাঁহাদের দেশের নামে রক্ষিত! এমন কি, গৃহ-পালিত পশুপক্ষীর নামের সহিতও একটা স্মৃতিরক্ষার উপদেশ থাকে। একটা গাভী বৃহস্পতিবারে বাছুর প্রসব করিল, বাছুরটীর নাম হইল "বৃধী," মঙ্গলবারে প্রসব হইল, নাম রাখিলাম "মঙ্গলা," ইত্যাদি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে লৌকীন অর্থ-বিহীন নামের ছড়াছড়ি। তাই বলিয়া মানুষের নাম "খাঁকশিয়াল মজুমদার (মিষ্টার ফক্স্)," "শূকর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মিষ্টার হগ্)," "সদর রাস্তা দাস ঘোষ (মিষ্টার ষ্ট্রীট)," "শ্রীমতী নবীন নাগর দাসী (মিস্ ইয়ং লাস্ব্যাণ্ড)।" ইত্যাদি রাখিতে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের কখনও রুচি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যে নীতি অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজে পুত্র কন্যার নাম রাখার ব্যবস্থা, তাহা প্রকৃতই জ্ঞানানুশীলনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুত্রের নাম রাখিলাম "নির্ম্মল"। নির্ম্মল শব্দটির অর্থ আছে। নির্ম্মলকে নির্ম্মল বলিয়া ডাকিলে, "আজ্ঞে" উত্তর দিবার সময় নির্ম্মলকে মনে করিতে হইবে যে, প্রকৃতই সে নির্ম্মল কি না? এইরূপে "পবিত্র"কে পবিত্র, "বিমল"কে বিমল, "সুশীল"কে সুশীল, "সত্যেন্দ্র"কে সত্যবাদী প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পন্ন করিবার জন্যই

জনক জননী পুত্রকন্যার ঐ প্রকার নাম রাখিয়া থাকেন। ছেলে মেয়েদের নাম অন্য কোনও পুণ্য বাচক শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করিয়া থাকি। যথা :— রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ, নন্দ, গৌরী, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি। এইরূপ নাম রাখায় কি সার্থকতা তাহা বলিতেছি।

একটি বিকারগ্রস্ত রোগী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে তাহার কি হইতেছে, সে তখন কিছুই জানিতে পারিতেছে না। চিকিৎসক আসিয়া রোগীকে ঔষধ সেবন করাইলেন। রোগী তাহা জানিতেও পারিল না। ঔষধ কিন্তু রোগীর দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। ঔষধের ক্রিয়ায় রোগী পুনরায় জ্ঞান লাভ করিল। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইলাম যে ঔষধ প্রয়োগের বিষয় রোগী অবগত না হইলেও, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ কিন্তু মূল প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া সংজ্ঞাহীনের সংজ্ঞা আনয়ন করিয়া দিল। সেইরূপ, আমাদের দেব-দেবীর নাম গুলিতেও যদি ভবব্যাধি দূর করিবার মহৌষধি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে মানে মনে করিয়াই হউক, আর নাই হউক, সে গুলি উচ্চারণ করিলে মনের বিকার একদিন না একদিন বিদূরিত হইবেই হইবে।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে বিষ্ঠা দেখিয়া ঘৃণা হইল। সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস বশতঃ মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল, রামচন্দ্র, রাধামাধব, নারায়ণ, অথবা এই প্রকারে কোনও একটি পুণ্যবাচক শব্দ। হাতি-ঘোড়া, কাশীপুর-চিৎপুর, জ্যাম-জুস, ব্লাডি-হেল্, বাই-ম্যাডাম্যাকাক্স, এইরূপ একটা যা' তা' শব্দ বাহির করিলাম না। ঘৃণা করা বড় দোষ। কোনও বস্তুকেই আমাদের ঘৃণা করিবার অধিকার নাই। তবে কোনও কোনও স্থলে স্বভাবতঃ ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। বিষ্ঠা দেখিয়া ঘৃণা হওয়াও অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ঐ বিষ্ঠাই পূর্ব্বে অতি সুখাদ্য আহার্য্য সামগ্রী ছিল, যাহা আমারই ন্যায় কোনও মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়া এখন ঘৃণার বস্তু বিষ্ঠা! ঘৃণা করিবার অধিকার আছে কি? কিন্তু ঘৃণা হইল। সেই ঘৃণাজনিত পাপটুকু, হেলায় হউক আর শ্রদ্ধায় হউক, সঙ্গে সঙ্গে দূর করিবার জন্য একটি পুণ্যবাচক শব্দোচ্চারণ, কি সুন্দর ব্যবস্থা!

নামে রুচি থাকা চাই। নামের শক্তি, মহাশক্তি। এক একটি নাম না জানি কত বাল্মিকি কত কোটি কোটি বার, কত অনুরাগ ও ভক্তির সহিত জপ করিয়াছেন; না জানি এক একটি নামে কত সহস্র সহস্র সিদ্ধ সাধকের সাধন-শক্তি বর্ত্তমান! পবিত্র রাম নাম জপ করিয়া যাঁহার কৃপায় রত্নাকরের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যক্তি বাল্মিকী মুনি হইয়া রামায়ণ রচনা করিতে সমর্থ হয়েন তাঁহার কৃপায় ইচ্ছা করিলে তুমি কি না হইতে পার?

জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল তত্ত্বই আমাদের দেশবাসীর নিকট বহু পূর্ব্ব হইতে সমরে চর্চ্চিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এ দেশে সকলই সঞ্চিত আছে, সকলই পাওয়া যায়। "উৎকৃষ্ট" না থাকিলে যেমন "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" কথার মানে হয়না, সেইরূপ আমাদের দেশে "অর্থ"ও আছে, "পরমার্থ"ও আছে। তবে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। সংসারে বাস করিতে হইলে, অর্থ ও পরমার্থ উভয়ই প্রয়োজন। সেই জন্যই আমাদের হিতাকাঙ্খীগণ উপদেশ দেন যে, "কায-কর্ম্ম" কর, নহিলে সংসারে চলিবে কিরূপে? গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।"

(তৃতীয় অধ্যায় ১৯ শ্লোক)

এখানে "কার্য্য" ও "কর্ম্ম" সমানভাবে আচরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্য্য ও কর্ম্ম দুইটি পৃথক বস্তু, তাহা না হইলে "সমানভাবে আচরণ" করিতে বলিবার তাৎপর্য্য কি? কার্য্য মানে কর্ম্ম নহে, কর্ম্ম মানেও কার্য্য নহে। কার্য্য বহির্জ্জগতের, যথা,—কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য, ইত্যাদি। কর্ম্ম অন্তর্জ্জগতের যথা,—আত্মকর্ম্ম, নিত্যকর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, ইত্যাদি। "কায-কর্ম্ম" করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য জনক রাজার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ।

নামের মাহাত্ম্য চিরকাল উপলব্ধি করিবার জন্য ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটী নরনারী, হিন্দু পৌত্তলিকের তেত্রিশ কোটি দেব দেবী। সকল রমণীতেই যদি মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, তাহা হইলে ভারতমাতার মাতৃমূর্ত্তি চোখের সম্মুখে স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। যে আনন্দ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, ভারতমাতা নামের মানে কি, "বন্দে মাতরম" মন্ত্রের উদ্দেশ্য কি? সে মন্ত্র কত মধুর, কত পবিত্র!

অন্ধ্রদেশে নামের প্রভাব সর্ব্বত্র। দেশে, আমাদের ভাষায় রচিত নামগুলির মধ্যে কিছু মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব আছেই আছে। সেই মাধুর্য্য ও সেই বিশেষত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য চাই,—"নামে রুচি"।

দেব-দর্শন

[শ্রীমতী নিরুপমা দেবী]

হে সত্য, তোমারে আমি করি নমস্কার,
বারম্বার,
আমার সকল সত্য আমার সকল সত্য দিয়ে,
আমার ভক্তির সাথে হৃদয়ের শক্তি মিশাইয়ে
তোমায় স্বীকার করি।
প্রাণের প্রণতি দিয়ে বার বার স্মরি
আপনারে নত করি সম্মুখে তোমার,
হে সত্য, তোমারে আমি করি নমস্কার!

যে দেবতা এ আকাশে
আলোর মূরতি ধরি নিত্য নেমে আসে
ধরণীর ঘরে ঘরে,
যে দেবতা প্রতি ধূলি কণিকার অন্তরে অন্তরে
প্রতি ফুলে তৃণে
যে দেবতা মর্ত্যমানবের লাগি গৃহ চিনে চিনে
দিয়ে যায় অন্ন রাশি
কেটে লয় মানবের অঙ্গ আর হাসি
কেটে লয় দুঃখ দুখ,
যে দেবতা সতত উন্মুখ
মানবের প্রেম লাগি।
বিরহ বেদনা ভরা অনুরাগে নিত্য অনুরাগী;
যে দেবতা
সসম্মানে তুলে নিতে লাঞ্ছনার ব্যথা
প্রেমিকেরে শক্তি দিয়ে যায়,
নির্জ্জনে দুর্গম পথে সঙ্কেত দেখায়,
অন্ধকার রজনীতে, ক্ষতি আর ক্ষত হানে বুকে বারে বার,
কাঁদিয়া আকুল হয় আপনি আবার!
যে দেবতা প্রেম পিপাসায়
পাতকীর বুকে বুকে আলিঙ্গন করে!
পতিতের গলা ধরে কাঁদে,
বিলম্বগামীরে নিজ বাহু দিয়ে বক্ষ মাঝে বাঁধে।

যে দেবতা মাটী কাটে,
রৌদ্র তাপে কর্ম্মক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাটে
যে দেবতা করে চাষ,
বস্ত্রহীনে, পাত্র গড়ে, শৌণ্ড ভাঙ্গে নিত্য যার বাস,
নিরন্নের ঘরে ঘরে রহে উপবাসী।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে আসি
বিতাড়িত হয় দ্বারে দ্বারে,
প্রবলের পদতলে নিষ্পেষিত হয় বারে বারে
করেনা মিথ্যায় পূজা যে দেবতা তবু,
অসত্যের পদতলে কভু
আপনারে করে না অর্পণ,
হৃদয় শোণিতে করে অশ্রুর তর্পণ।
যে দেবতা কবে কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসিয়াছে যাত্রা পথ স্রোতে,
অনন্ত পথের শেষে কোথা হবে পার
পূর্ণতম প্রকাশের খুঁজিছে আঁধার
মানবের দেহে দেহে,
ভক্তি প্রীতি স্নেহে
আপনারে দিয়েছে যে ধরা,
সসীমের রূপ রস গন্ধ দিয়ে ভরা!
যে দেবতা এক হাতে নিয়ে থাকে বন্ধনের মালা
উদ্বেলিত
অন্য হাতে মুক্তির অমৃত!
সে দেবতা সত্য হয়ে আছে,
অনুভূতি ভরা মোর হৃদয়ের বড় কাছে কাছে!

যে দেবতা তোমারেই সত্য বলে জানি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে মানি
আমার সকল সত্তা তোমারেই করে যে স্বীকার
হে সত্য তোমারে আমি করি নমস্কার।

বর্ণ বিভ্রাট

(গল্প)

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মুন্সী]

বৃষ্টি রৌদ্রের সমাবেশে আকাশে রামধনুর উদয় সকলেই দেখিয়াছেন। যদি উহার বর্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে হয়ত কেহ বলিবেন উহা গোলাপী আভার ভরপুর সঙ্গে ঈষৎ নীল, কেহ বলিবেন সবুজ এবং পীত বর্ণও ত উপেক্ষণীয় নহে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বলিবেন যে রামধনুতে বেগুনে, নীল, আকাশী, সবুজ, পীত, কমলা এবং লোহিত এই সপ্ত বর্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমি যথা সময়ে উক্তধনুর এই সাতটি বর্ণ সম্বন্ধে আপনাদিগকে সাতটি বিভিন্ন গল্প বলিব। আপনারা হয়ত ভাবিতে পারেন বর্ণের আবার গল্প কি! আর যদিই বা কিছু বলা হয় তবে উহা ত গল্প হইতে পারেনা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা ওই ধরণের একটা কিছু হইবে। আমি আশ্বাস দিতেছি, নিরাশ হইবার কারণ নাই কেন না আমি আদৌ বৈজ্ঞানিক নহি। যাহা হউক এইবার আমি গল্পের অবতারণা করিব। অদ্যকার বিষয়—কমলাবর্ণ।

অদ্ভুত পেন্সিলটা

(কমলাবর্ণ)

একদা প্রাতরাশ সমাপনান্তে অধ্যাপক বৃদ্ধ তাঁহার সহকারী কুমারী ইলাকে একটা ছয় পেন্সিল দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি ইতঃপূর্ব্বে এ রকম জিনিষ দেখিয়াছ?"

উক্ত অধ্যাপকটি লণ্ডনের একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্। তৎকালে পাশ্চাত্য খণ্ডে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ছিল না এবং তিনি বর্ণবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়া সমগ্র জগতকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অধ্যাপক প্রদত্ত পেন্সিলটি আবলুস কাষ্ঠে নির্ম্মিত; আকৃতি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। উহা ডেনিস্ দেশীয় প্রথায় গঠিত একটি ত্রিভুজাকৃতি বাটি। পাদদেশ বেষ্টিত একটা চক্রবর্ত্ম সর্প সুচারুরূপে ক্ষোদিত এবং পেন্সিলটির পৃষ্ঠদেশ ও চতুষ্পার্শ্ব উজ্জ্বল কমলা বর্ণে চিত্রিত ছিল।

ইলা উত্তর করিল "না আমি জীবনে কখনও এরূপ জিনিষ প্রত্যক্ষ করি নাই—ইহা কি?"

অধ্যাপক বলিলেন, "আমিও এর সুনিশ্চিত উত্তর প্রদানে অক্ষম কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে এই ক্ষুদ্র জিনিষটাই হয়ত আমার জীবনে মস্ত বড় একটা বৈচিত্র্য আনয়ন করিবে।"

"কিরূপে ইহা আপনার হাতে আসিল এবং এসম্বন্ধে আপনার ধারণাই বা কি?"

অধ্যাপক একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, মনে হইল কি যেন একটি ভাবী বিপদাশঙ্কায় তাঁহার প্রাণে অত্যধিক চাঞ্চল্যের উদয় হইয়াছে। কিয়ৎকাল নীরবতার পর তিনি উত্তর দিলেন "ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আমার সম্পূর্ণ ধারণাতীত এবং কিরূপে যে ইহা আমার নিকট আসিল তাহাও আমার কল্পনার বাহিরে। অদ্য প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিবার পর আমার পকেটে ইহা প্রথম দেখিতে পাইলাম। এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করা দুষ্কর হইবে বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"

ইলা পুনঃ প্রশ্ন করিল "আপনি কি পূর্ব্বে ইহা কখনও দেখেন নাই ?"

"এই প্রথার গঠিত সহস্রাধিক পেয়ালা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ গঠন বৈচিত্র্য কদাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কয়েক দিবস পূর্ব্বে আমার শয়নাগারে এই প্রকারের পৃষ্ঠদেশ কমলা বর্ণে চিত্রিত বাটি কখনও বা ভাবস্রোতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণিকের দর্শন দিয়া মিলাইয়া যাইত কখনও বা পাশ-নিয়ত অবস্থায় পুস্তকের পৃষ্ঠার ভাসিয়া উঠিত ; গতকল্য কলেজে যখন অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম সহসা লক্ষ্য করিলাম যেন এই রকমের একটা ভগ্নপেয়ালা আমার সম্মুখস্থ কাই-ফলকে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। অবশেষে আজ যথার্থই ইহা মূর্ত্ত হইয়া আমার জামার পকেটে বিরাজ করিতেছে।"

ইলার বিস্ময় অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইল, পরে বিস্ময়ের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে সে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার উদ্দেশ্য কি ?"

অধ্যাপক বলিলেন, "উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ইহার নিরাকরণ করিতে আমি কৃত-সংকল্প স্থির জানিও এবং এই জন্য তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি ; হয়ত এটা খুবই বিপদজনক কার্য্য হইবে কিন্তু আমার মনো-বিজ্ঞানের একটা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তোমাকে বিপদাপন্ন করিবার ইচ্ছা আমার নাই সুতরাং তুমি যথাসম্ভব নির্লিপ্ত থাকিয়া আমার সাহায্য করিও।

এ যাবৎকাল অধ্যাপক বুথের সঙ্গে বহুবিধ কঠিন পরীক্ষায় ব্রতী থাকিয়া ইলার মনে একটু গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল, অধিকন্তু কার্য্যকালে একাধিক বার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই বলিয়া সে মনে মনে ভাবিল—অধ্যাপক এ সামান্য বিষয়টি একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিয়াছেন। এই ভাবিয়া সে উত্তর দিল, "আমার মনে হইতেছে যে আপনি এ বিষয়ে একটু ভুল করিয়াছেন।"

অধ্যাপক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে ইলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে পুনঃ বলিল, "আপনি আমাকে এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন সত্য, কিন্তু কোন কার্য্যই ত আমার অজ্ঞাত থাকিবে না। আপনি যখনই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন পর মুহূর্ত্তেই উহা আমার মনে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হইবে। আপনারই শিক্ষার ফলে আমার মানসিক শক্তির এইটুকু বিকাশ হইয়াছে।"

অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে উপরি লিখিত এই ব্যাপারটীর বিষয় সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সম্মুখে একটা জিনিষ দেখিতে পাইলাম—লক্ষ্য করিলাম উহার বর্ণ সবুজ। শুধু দৃষ্টিতে জিনিষটা কঠিন কি তরল বোঝা গেল না। স্পর্শে বুঝিলাম উহা কঠিন পদার্থ। ইহাকে কি বলিব, ইহার নামই বা কি ? দৃষ্টিতে কতকগুলি বর্ণাকৃতি ব্যতীত বিশেষ কিছুই লক্ষিত হইল না, ক্রমশঃ স্মৃতিশক্তির সহায়তায় স্পর্শ দ্বারা উহার স্বভাবধর্ম্ম এবং আকৃতি নিরূপণ করিলাম। সঙ্গী বলিয়া দিল এই প্রকারের পদার্থকে "গাছ" বলা হয়। সেইদিন হইতে উহাকে "গাছ" বলিয়া আসিতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যাবতীয় পার্থিব দ্রব্য দেখিতে হইলে উহাদের বর্ণ সমষ্টি বা বর্ণাকৃতি সমূহ নিরীক্ষণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমাদের মস্তিষ্ক যখনই কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে চক্ষুদ্বয় তখন কেবল মাত্র বর্ণাকৃতি সমূহ দর্শন করিবে। এই তথ্যই সর্ব্বপ্রকার মানসিক উৎকর্ষতা লাভের ভিত্তি স্বরূপ। কি প্রকারে আমরা দ্রব্যসমূহ দেখিতে পাই উহার আলোচনা বর্ত্তমানে করিবার ইচ্ছা নাই তবে ইহাও বর্ণ-তরঙ্গের ক্রিয়া এই কথা জানিলেই

বর্ত্তমানের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমাদের মস্তিষ্ক * 'রঙ্গতন্মাত্রে' পুঞ্জীভূত ভাবস্রোতের এক একটা কেন্দ্র বিশেষ। বর্ণের বিদ্যমানতা এইরূপ ভাবস্রোতের কেন্দ্র মস্তিষ্কে, বর্ণযুক্ত পদার্থে নহে। ঐ স্থানেই জীবতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্বের পার্থক্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। অন্ধ ব্যক্তিরও বর্ণের অনুভূতি আছে, আলোকরুদ্ধ গৃহেও বর্ণ লক্ষিত হয়। কেন না বর্ণতরঙ্গ মস্তিষ্ক স্নায়ুমণ্ডলের স্পন্দন উৎপন্ন করিয়া উহাকে অনুভূতি সম্পন্ন করিয়া তোলে। মানবের সমুদয় কার্য্য, চিন্তা, গতিবিধি উহারা জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে যে ভাবেই সম্পন্ন হউক না কেন প্রত্যেকটীই এক একটা প্রচ্ছন্ন বর্ণাকৃতি হইতে জাত এবং চিত্তের একাগ্রতা রক্ষা করিলে যথোপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্কে এই জাতীয় কার্য্যাবলীর বিভিন্ন বর্ণচিত্র সমূহ প্রতিফলিত হইবে; অবশ্য এই পরীক্ষায় ব্রতী ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি পরীক্ষার্থীর ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে যে পর্য্যাপ্ত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

ইলার অত্যধিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধ্যাপক তাহাকে যোগদানের সম্মতি দিলেন এবং সঙ্গে করিয়া পরীক্ষা গৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ও অল্পপরে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

পরীক্ষা গৃহটী একটি প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত গোলক বিশেষ। উহার নির্ম্মাণ প্রণালী অতি মনোরম, দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হইয়া যায়; সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব্ব কলা কৌশলে প্রস্তর নির্ম্মিত গোলকটীও যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিলেও কৃত্রাপি একটী দাগও লক্ষিত হইবে না। এক পার্শ্বস্থ দেওয়ালের অর্দ্ধোচ্চস্থানে মকোপরি দুইটী কেদারা রক্ষিত হইয়াছে এবং তদূর্দ্ধে নাতিদীর্ঘ ছিদ্রপথে চারিটী বৃহৎ আলোকাধার হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক বিকীরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এবম্প্রকার ব্যবস্থা যে পরীক্ষকের চিত্তের একাগ্রতা রক্ষার্থেই হইয়াছে ইহা সহজেই অনুমেয়।

অধ্যাপক ও ইলা কেদারায় উপবিষ্ট হইয়া ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন, পরমুহূর্ত্তেই উজ্জ্বল আলোকে গোলক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভৃত্য পেয়ালাটী * ইলাকে দিয়া বলিলেন, "ইহা ধরিয়া রাখ এবং একাগ্রচিত্তে সম্মুখস্থ গোলক প্রাচীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর"। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে ইলার মনে হইল যেন চতুষ্পার্শ্বস্থ আলোক স্নান হইতে ম্লানতর হইয়া যাইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার হস্তস্থিত পেয়ালার অনুরূপ একটী বিশালকায় ভৃত্য পেয়ালা চতুষ্পার্শ্ব উজ্জ্বল কমলা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ইলার পক্ষে এরূপ ভয়াবহ চিত্তের প্রখরতা অসহনীয় হইয়া উঠিল, এবং হস্তস্থিত পেয়ালাটীর দৃঢ়মুষ্টি নিজের অজ্ঞাতসারে শিথিল হইয়া গেল, হয়ত মুহূর্ত্তমধ্যে উহা হস্তচ্যুত হইবে এমন সময়ে পেয়ালাটীর পাদদেশে অঙ্কিত কৃষ্ণসর্পটী যেন জীবন্ত হইয়া সাক্ষাৎ সমন রূপে ফণা বিস্তার পূর্ব্বক ইলার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল তন্মুহূর্ত্তে শিথিল মুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া পেয়ালাটী নিম্নে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং ইলা মকোপরি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অধ্যাপক দুঃখে, ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছান্তে ইলা উঠিয়া বসিল এবং পরীক্ষা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অধ্যাপকের বিশ্রাম কক্ষে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না। পুনঃ পরীক্ষার প্রচেষ্টা ইলার মনে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল কিন্তু একবার যে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে শত চেষ্টাতেও তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই চিন্তা তাহাকে হতাশ করিয়া তুলিল।

* chromatic centre of ideation

কয়েক ঘণ্টা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবার পর সে অধ্যাপকের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থারকে ডাকিয়া সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া উত্তরে ষ্টেশনে ও ষ্টীমার পুলিসের সাহায্য লাভের আশায় যাত্রা করিল।

বাহিরে প্রচণ্ড ঝটিকা করাল মূর্ত্তিতে দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণে এই প্রচণ্ড বেগময় প্রলয়কারী ঝটিকার গভীরতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। হুহু করা, আর তার সঙ্গে সর্ব্বদিক হইতে প্রবলবেগে সঞ্চরণশীল ধূম-প্রবাহবৎ ধূলিরাশি। যে দিকে চাই—সেই দিক হইতে কেবল ঝটিকাছিন্ন বৃক্ষলতাদির শাখা প্রশাখা লম্ভাস্থক তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে। প্রকৃতির এমন তাণ্ডবলীলা বহুদিন পূর্ব্বেও দৃষ্ট হয় নাই। পথ চিনিয়া অগ্রসর হইবার উপায়ও বন্ধ। চোখ চাহিয়া কোন দিকে দেখিবারও উপায় নাই; উড়ন্ত ধূলির কাপটায় চোখ একেবারে অন্ধ হইয়া যায়।

ষ্টীমারের গাড়ীর চালক বলিল,—"এ দুর্য্যোগে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। ঝড়ের বেগ একটু প্রশমিত না হইলে আর গাড়ী চালান যাইবে না।" প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে প্রকৃতির একটু শান্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহারা পুনঃ অগ্রসর হইল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ডরপেয়ালা সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এই পেয়ালা সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখেন কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ইহা কখনও দেখি নাই বা এ বিষয়ে কিছুই জানি না, তবে আমার সহকারী কানলিফ্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বলিতে পারিবে।"

প্রধান কর্ম্মচারী কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে তাঁহার সহকারীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কানলিফ বলিষ্ঠ, সুপুরুষ। তাহার নয়নদ্বয়ে যেন একটা প্রতিভাব্যঞ্জক ভাব পরিস্ফুট। কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের অপব্যবহার না করিয়া সে ইলাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি ইহা কোথায় পাইয়াছেন?" ইলা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে পুনর্ব্বার বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহা কি করিয়া আপনার নিকট আসিল এ বিষয়ে আপনার কোনই অভিজ্ঞতা নাই।" ইলা আগ্রহান্বিতা হইয়া প্রশ্ন করিল "তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন!" "হাঁ কতকটা জানি বৈ কি, তবে এখনও ঠিক বুঝিতেছি না।" পরে প্রধান কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তিন বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্যবস্থাপক সভার দর্শকবৃন্দের মধ্যোপরি গুলিবিদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি হত হইয়াছিল তাহার হাতেও এই রকমের একটা পেয়ালা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেবার হত্যাকারীকে ধরিবার শত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, কোন বিশেষ গুপ্ত সমিতির দলপতি কাহারও প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিয়া এই প্রকারের একটা ডরপেয়ালা পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ প্রেরণ করিয়া থাকে।"

অতঃপর ভয়ে বিবর্ণা ইলাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কানলিফ বলিল, "আমি এখনই অধ্যাপকের সংবাদ আনিয়া দিতেছি, আপনি বাড়ীতে অপেক্ষা করুন"।

গভীর রাত্রিতে আর্থার ও ইলা বাড়ী ফিরিয়া যে যে স্থানে অধ্যাপকের থাকিবার সম্ভাবনা, টেলিফোন করিয়া দেখিল কিন্তু কোন সংবাদই পাইল না। বর্ত্তমান ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইলা মুহ্যমান হইয়া পড়িল এবং সম্মুখীন্ বিপদের গভীর চিন্তায় সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিল। প্রত্যূষের পূর্ব্বে কোন চেষ্টা করা সম্ভব নহে বুঝিয়া সে শয্যাগ্রহণ করিল। কিন্তু নয়ন মুদিত করামাত্র সেই ডর-পেয়ালার বিভীষিকা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অবশেষে

নিরুক্ত হইয়া মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল, যে প্রাণপণ চেষ্টায় এই চিন্তা মন হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। তজ্জন্য সে স্বীয় শিক্ষা দাতা অধ্যাপক বৃন্দের মুখচ্ছবি কল্পনা করিতে সচেষ্টা হইল। অনন্তরে ইলা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—মেঝিতে পাইল যেন নিদারুণ যন্ত্রনায় অভিভূত হইয়া তাহারই প্রিয় শিক্ষক, মলিন, বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহার আর্ত্ত নয়ন দুটীর দৃষ্টি ইলার প্রতি নিবদ্ধ এবং নীলাভ ওষ্ঠদ্বয় যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ডাকিতেছে—"ইলা ইলা ——"।

অসহনীয় শীতের আতিশয্যেও ইলা ঘামিয়া উঠিল, তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে বিছানা পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষাগৃহ অভিমুখে ধাবিতা হইল। গমন পথে আর্থারের শয়ন কক্ষে করাঘাত করায় আর্থার বাহিরে আলিলে রুদ্ধশ্বাসে তাহাকে আলো জ্বালিতে উপদেশ দিয়া ইলা পরীক্ষা গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কী যেন একটা নবশক্তির অপূর্ব্ব প্রেরণায় তাহার সমস্ত দেহে শিহরণ অনুভূত হইল, সে স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ঐ চিন্তায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিল। অনতিবিলম্বে সম্মুখস্থ গোলক প্রাচীরে উজ্জ্বল কমলাবর্ণ তরঙ্গোল্লাস আবির্ভাব হইয়া অনন্তরে মিলাইয়া গেল। তৎপরে সেই স্থানে চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলীর ন্যায় প্রথমে বৃহৎ মসৃণ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী, পরক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ দৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে সমবেত ব্যক্তিগণের সকলেরই দৃষ্টি পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ির প্রতি নিবদ্ধ। মনে হইল যেন তাহারা কোন সম্ভ্রান্ত অতিথির আগমন অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানটী ইলার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিয়ৎক্ষণ পরে সোপান শ্রেণীতে সদৃশ বহুমূল্য পোষাকে সজ্জিত দুইটী বিভিন্ন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তাহারা অগ্রসর হইলে চিনিতে পারিয়া ইলা অসহ্য বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া পড়িল কারণ আগন্তুকগণ সকলেই স্থানীয় রাজপরিবার ভুক্ত। এইবার সমস্ত ব্যাপারটা ইলার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল, সে এতক্ষণ তন্মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে রাত্রকীয় অভ্যর্থনার সমারোহ লক্ষ্য করিতেছিল। সমবেত নরনারীর অভিবাদন ও বিপুল অভ্যর্থনার ভিতরে নিমন্ত্রিতগণ ধীরপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল সহসা একটী দৃশ্যে ইলা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে অধ্যাপকের অস্ফুট মূর্ত্তি তাহার মানসপটে ক্রমোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইলা রুদ্ধশ্বাসে পরবর্ত্তী ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। অধ্যাপক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া ইলার দৃষ্টি অদূরে দণ্ডায়মান জনৈক সৈনিকের প্রতি নিরদ্দিষ্ট করিল। ইলা দেখিল যে সৈনিকটী অস্থির ভাবে কক্ষমধ্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, হস্তদ্বয় পশ্চাতে মুষ্টিবদ্ধ। পরক্ষণেই নিমন্ত্রিত রাজ পরিবারকে প্রকোষ্ঠ অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার চক্ষু দুটী হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল এবং নিমেষ মধ্যে একটা প্রাণ-সংহারক বোমা তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল কিন্তু কি যেন একটা অজ্ঞাত কারণে বোমাটী তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল।

ইলা আর ভাবিতে পারিল না, তাহার সম্মুখস্থ সমস্ত দৃশ্যাবলী যেন মসীলিপ্ত হইয়া গেল এমন সময়ে আর্থার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ইলা শীঘ্র এস, পুলিশ টেলিফোন করিয়াছে বোধ হয় তাহারা কাকার সন্ধান পাইয়াছে।"

ইলা উন্মত্তের মত প্রশ্ন করিল, তিনি—?"

"পুলিশ বিস্তারিত কোন সংবাদ দেয় নাই কেবল মাত্র তোমাকে যাইতে বলিয়াছে শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া নাও; বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।"

তাহাদের গাড়ী পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত

হইবামাত্র কান্‌লিফ্‌ ও তাহার সঙ্গীগণ মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল এবং চালককে গন্তব্য স্থানের সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপদেশ দিয়া ইলাকে বলিল, "কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অধ্যাপক আমাদিগকে ফোন করিয়া বলেন যে তিনি কতকগুলি চতুর গুণ্ডার দ্বারা অনুসরণ করিতেছেন, আমরা যেন অনতিবিলম্বে তাঁহার সাহায্যে যাই নতুবা তাঁহার স্বীকৃত বিপন্ন হইবার আশঙ্কা খুবই প্রবল।"

এই সময়ে তাহাদের গাড়ী একটী সুদৃশ্য অট্টালিকার অদূরে থামিয়া গেল, গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে সকলে অগ্রসর হইল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই একটী ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখীন হইল। তথায় পূর্ব্ব হইতেই একজন পুলিশ প্রহরী রক্ষিত ছিল, ইলা তাঁহাকে চুপি চুপি কি জিজ্ঞাসা করিতে সে ইঙ্গিতে অন্য একটী রুদ্ধ কক্ষ নির্দ্দেশ করিল। তথায় গমনাগমনের একটা স্বল্প পরিসর পথ ছিল। ইলা নিঃশব্দে কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা একজন কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিহিত প্রহরী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই অচিন্তনীয় বিপদে ইলা ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বোকার ভাণ করিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই যে, তোমায় দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, ভাল ত?" সে কটোর দৃষ্টিতে ইলার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে চেষ্টা করিল। সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকার ছিল বলিয়াই ইলার চাঞ্চল্য সে দেখিতে পাইল না। তৎপরে ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি মাতাল হইয়াছ, যাও এই মুহূর্ত্তেই এস্থান পরিত্যাগ কর।"

ইলা বলিল, "আমি যাইব না, আমি এখানেই থাকি এবং মাতালও হই নাই তবে আমার মনে হইতেছে তুমি অত্যন্ত রুক্ষ ভাষী"।

সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া ইলাকে গলিপথে টানিয়া লইয়া চলিল, ইতিমধ্যে কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া কান্‌লিফ্‌ ও আর্থার দ্রুতপদে তাহাদের নিকট আসিল। ইলা এতক্ষণ আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করে নাই এবার সুযোগ বুঝিয়া সহসা তাহাকে এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ভূমিশায়ী করিল এবং তৎক্ষণাৎ অপর সঙ্গীদ্বয় তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল, ইলা বন্দীর পকেট হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল এবং অদূরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত আলোক-রশ্মি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। সেই কক্ষ দ্বারেও পূর্ব্ববৎ আর একজন প্রহরী দৃষ্ট হইল। কান্‌লিফ্‌ স্বীয় পরিচ্ছদ খুলিয়া প্রহরীর মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া নিমেষ মধ্যে তাহাকে ভূতলশায়ী করিল, কঠিন হস্তের গুরু নিষ্পেষণে হতভাগ্য প্রহরী একটী বর্ণও উচ্চারণের পূর্ব্বেই চিরবিদায় গ্রহণ করিল। ইলা দ্বারের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে একটী অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিল।

প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ সুসজ্জিত দীর্ঘ টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি ব্যক্তি নিঃশব্দে উপবিষ্ট। সকলেই গাঢ় কমলাবর্ণের পোষাকে সজ্জিত। টেবিলের আচ্ছাদন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং মধ্যভাগে ভেনিসদেশীয় প্রথায় গঠিত একটি সুবৃহৎ স্বর্ণপেয়ালা। পূর্ব্বর্ণিত পেয়ালা এবং ইহার গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ অভিন্ন। টেবিলের অপর প্রান্তে দলপতি গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট এবং তাহার সম্মুখে বদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান অধ্যাপক। অধ্যাপকের হস্তদ্বয় পশ্চাতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মম অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট রূপে বর্ত্তমান। দলপতি অধ্যাপককে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণা মিশ্রিত স্বরে বলিতেছিল, "এতদিনে বহু চেষ্টার পর তুমি আমাদের আয়ত্বাধীন হইয়াছ। আমাদের এই গুপ্ত সমিতির সন্ধান এ যাবৎ কেহই পায় নাই। তুমি জান যে আমাদের এই সমিতি ও তোমার চিন্তাধারা অভিন্ন। তবুও তুমি পুনঃ পুনঃ আমাদের বহু উদ্যম ব্যর্থ করিয়াছ। যখন সমগ্র ইউরোপ খণ্ড

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল সেই সময় হইতেই আমরা সৈন্য সংগ্রহ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্যাবধি বহুকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়া আসিতেছি। অদ্যও একমাত্র তুমি মনোবিজ্ঞানের এই আশ্চর্য্য প্রভাব আয়ত্ত করিয়াছ। তোমার অভিনপ্ত বিজ্ঞান আমাদের স্বপ্নের অতীত সফলতা লাভ করিয়াছে এবং তোমারই হস্তে শতকল্প আমাদের প্রিয় সৈনিক বন্ধুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। তুমি যদি তখন আমাদের বাধা না দিতে তাহা হইলে এতক্ষণ রাজ-বংশের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তোমার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড, কিন্তু যদি তুমি আমাদের সমিতিভুক্ত হইতে সম্মত হও তবে আপাততঃ তোমার প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

অধ্যাপকের চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "যতই শোচনীয় মৃত্যু আমার হউক না কেন—যতই কষ্টকর মৃত্যু আমার অদৃষ্টে ঘটুক না কেন, এ ঘৃণ্য প্রস্তাবে আমি কখনই স্বীকৃত নহি।"

"তবে তাহাই হউক"—বলিয়া দলপতি পার্শ্বস্থ অনুচরকে ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিয়া একটী গুলিপূর্ণ রিভলবার অধ্যাপকের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া তুলিল। আর এক মুহূর্ত্তমধ্যে একটী অমূল্য জীবন পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে! সহসা দ্বার ভগ্ন করিয়া কাবুলিদ্ একদঙ্গে প্রবিষ্ট হইল এবং আততায়ীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল, নিমেষমধ্যে হতভাগ্য জীবন হারাইয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। অতর্কিত বিপদপাতে অপ্রস্তুত দস্যুদলকে পুলিশ অবলীলাক্রমে বন্দী করিয়া ফেলিল। ইলা উন্মত্ত ভাবে দৌড়াইয়া গিয়া অধ্যাপককে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে লাগিল। বন্ধনমুক্ত অধ্যাপক প্রশান্তভাবে ইলার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই জানিতাম যে তুমি আসিবে।"

স্থপতি বিজ্ঞান ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

[শ্রীযুক্ত হৈমেশ্বর সান্যাল]

স্থপতি বিজ্ঞান বলিতে প্রধানতঃ গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যা বা সৌধশিল্প বুঝায়। তাহার সাহায্যে শিল্পীর মনোগত ধারণা বাহ্য আকারে প্রকাশিত হয় বলিয়া, তাহাকে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শাস্ত্রের অন্তর্গত করা যায়। সে হিসাবে, চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্যবিদ্যার ন্যায় তাহা ললিত-কলা ভুক্ত হইবে।

সাধারণতঃ, জাতীয় উন্নতির সহিত প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব স্থাপত্যশিল্পে দৃষ্ট হয়। জাতীয় ভাষার সহিত স্থাপত্যশিল্পের সম্বন্ধও সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয়ই জাতির মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই শিল্প সাহায্যে জাতির স্মরণ যোগ্য ঘটনাবলী প্রস্তরোপরি স্থায়ী ভাবে লিপিবদ্ধ হওয়াতে তাহাকে জাতীর চিরস্থায়ী ইতিহাস (strong records of nation) বলা হয়।

স্থাপত্যশিল্পের প্রাথমিক ধারা মিশর (Egypt) ও এসিরিয়া (Assyria) দেশে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ-গণের মতে, তথাকার শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অন্যান্য স্থানের শিল্প প্রধানতঃ মিশর ও এসিরিয়া হইতে উদ্ভূত।

প্রায় ৩০।৪০ ফুট উচ্চ মঞ্চের উপর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাই এসিরিয়া শিল্পের বিশেষত্ব। শিলা-লিপি ও বৃহদাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি ভাস্কর্য্য তথায় সমধিক প্রচলিত ছিল। প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বেও এসিরিয়াবাসীগণ তম্ভ, তোরণমালা ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন।

মিশরের পিরামিড একটী আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। এই বৃহদায়তন গঠন প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

প্রাচীন মিশরবাসীগণের, সাধারণতঃ, অনন্তকাল স্থায়ী গঠন কার্য্যই লক্ষ্য ছিল। মিশরের কর্ণাক-মন্দিরের শোভা অতুলনীয় এবং (Sphinx) মূর্ত্তি শোভিত রাজপথ অনন্যসুলভ। মিশরের পাষাণ স্তম্ভ (Obelisk)আর একটী উল্লেখযোগ্য গঠন।

গ্রীস দেশীয় স্থাপত্যশিল্প প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন মিশর ও এসিরিয়াবাসীর নিকট উপকৃত, কিন্তু প্রাচীন গ্রীস-বাসীগণ প্রাপ্ত বিষয়ে এত পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন যে এখন তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলা যায়। ডোরিক, আইওনিক ও করিন্থিয়ান এই তিনটী ধারা গ্রীসদেশীয় স্থাপত্য রীতি ভুক্ত। তন্মধ্যে ডোরিক ধারা প্রাচীনতম, সরলতম ও দৃঢ়তম—সে কারণে ইহাকে পুরুষোচিত (manly Doric) বলা হয়।

গ্রীক নরপতি ডোরাস্ (Dorus) এর আজ্ঞামত জুনো (Juno)দেবীর মন্দির গঠিত হয়। ইহার অংশ সমূহে সুসমাবেশের অভাব ছিল। কিছুকাল পরে, আখেলবাসীগণ এপোলো (Apollo) দেবতার দৈববাণী অনুসারে এসিয়াতে উপনিবেশ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে আয়ন (Ion) এর নেতৃত্বে ১৩ জন উপনি-বেশিক পাঠান। আয়ন এর নাম অনুসারে তাঁহাদের অধিকৃত স্থানকে আয়োনীয়া (Ionia) বলা হয়। তথায় জুনো-মন্দিরের অনুকরণে এপোলো-মন্দির গঠন করিবার সময়, স্তম্ভের আকৃতি সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য, তাঁহারা পুরুষের চরণ পরিমাণ করিয়া জানিতে পারেন যে তাহা পুরুষের উচ্চতার প্রায় ষষ্ঠমাংশ। সেই হিসাবে, স্তম্ভের পরিমাণ (ব্যাস) উচ্চতার ষষ্ঠমাংশ রাখিয়া

স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। ডোরাস্ নরপতির নামানুসারে তাহা ডোরিক ধারাভুক্ত হয়। পরে ডায়ানা (Diana) মন্দির নির্ম্মাণ কালে, বর্ষীয়সী নারী-চরণের অনুকরণে, স্তম্ভের ব্যাস উচ্চতার অষ্টমাংশ রাখেন এবং পাদুকার অনুকরণে স্তম্ভের তলদেশ ভূষা মণ্ডিত করিয়া, বেণীর অনুকরণে স্তম্ভের শীর্ষদেশ কুণ্ডলিত ভূষা দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। পরিচ্ছদের ভাঁজের অনুকরণে, স্তম্ভ গাত্র নালীবিশিষ্ট (flu'ed) করা হয়। সেইরূপ গঠন প্রণালী আয়নের নামানুসারে আইওনিক-ধারা নামে অভিহিত। পরে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উক্ত ধারা দ্বয়ের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। যুবতী নারীদেহের অনুকরণে করিন্থিয়ান ধারার উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী সুন্দর কবিতা আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—*

প্রথম উদ্ভব হেরি "ডোরিক" প্রধার
আড়ম্বর-হীন শুদ্ধ নরদেহ প্রায়;
"আয়নিক" শিল্পে গাঁথা মাতৃকল্প নারী
সংযত বিলম্বিত বেশ, পরিশেষে হেরি
"কোরিন্থ" প্রণালী—বিভূষিত উদ্যম যথা
যুবতীর লীলা।

কুণ্ডলীবৎ শুদ্ধীর্ষ আইওনিক ধারার এবং একেবারে পত্ররাজি শোভিত শুদ্ধাগ্রভাগ, কোরিন্থিয়ান ধারার বিশেষত্ব। স্তম্ভশ্রেণীর অগ্রভাগ সদ্ধান (architrave) দ্বারা যুক্ত করিয়া দেওয়াই গ্রীক রীতির বিশেষত্ব।

কোরিন্থিয়ান ধারার শুদ্ধীর্ষ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। করিন্থ নগরে কোনও একটী কুমারীর মৃত্যু হইলে, তাহার ধাত্রী মৃত কুমারীর কতকগুলি প্রিয় সামগ্রী পূর্ণ একটী পাত্র টালির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মৃতের সমাধির উপর রাখিয়া দেয়। ঘটনা ক্রমে, সেই পাত্রের নিম্নে একেবাস্ বৃক্ষের মূল শিকড় নিহিত ছিল। পরে সেই মূল হইতে, পাত্রের চতুর্দ্দিকে পত্রাদি উৎপন্ন হইলে, সেগুলি উপরিস্থ টালীর অবস্থানের জন্য কুণ্ডলিত হইয়া যায়। সেই মনোহর দৃশ্য কালিমাকস্ (Callimachus) নামক ভাস্করের নয়ন গোচর হইলে, তিনি তদনুরূপ শুদ্ধীর্ষ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে করিন্থিয়ান ধারাভুক্ত করেন।

পরে রোমীয়গণ (Romans) আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে রূপান্তরিত করেন। ডোরিক ধারা মতে, স্তম্ভগাত্র নালীবিশিষ্ট করা হয় এবং স্তম্ভের পাদদেশ দেখা যায় না। রোমীয়গণ ডোরিক স্তম্ভের নালী বাদ দিয়া এবং স্তম্ভ-শীর্ষ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া পাদদেশ অবলম্বন যুক্ত করিয়া দেন। সেইরূপে পরিবর্ত্তিত ডোরিক স্তম্ভকে টাস্কান (tuscan) স্তম্ভ বলা হয়। আইওনিক ও কোরিন্থিয়ান ধারা দ্বয়ের সংমিশ্রণে সঙ্কর (composite) ধারা উদ্ভূত। গোলাকৃতি তোরণমালা রোমীয় স্থাপত্য রীতির বিশেষত্ব।

গ্রীস ও রোমীয় রীতিদ্বয়কে প্রাচীন যুগের স্থাপত্য শিল্প (classical architecture) বলা হয়। মধ্যযুগে স্যাক্সন স্থাপত্য (Saxion architecture) আরম্ভ হয়—ইহাই ইংলণ্ডের স্থাপত্য শিল্পের প্রাচীনতম ধারা। খৃষ্টজন্মের ৬শ হইতে নরম্যান বিজয় পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি কাল। তৎপরে নর্ম্মান স্থাপত্য (Norman architecture) দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। স্যাক্সন ও নর্ম্মান রীতিদ্বয় প্রকৃতপক্ষে রোমীয় রীতির অনুকরণে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

* First unadorned,
And nobly plain, the manly Doric rose:
The Ionic then, with decent matron grace,
Her airy pillar heaved; luxuriant last,
The rich Corinthian spread her wanton wreath

প্রতীচ্যে রোমান সভ্যতার সহিত রোমীয় স্থাপত্য-শিল্প লোপ পাইতে থাকে। চতুর্থ হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত, প্রাতীচ্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গঠন কার্য্য হয় নাই। কিন্তু সেই সময় প্রাচ্যে (Byzantine) স্থাপত্য শিল্প যথেষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল এবং তখন প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্য অধিকতর সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। গুম্বজ (Dome) বা গোলাকৃতি ছাদ, Romanesque ও Byzantine রীতিদ্বয়ের বিশেষত্ব।

পরে গথিক্ (Gothic) স্থাপত্য শিল্পের প্রচার হয়। তাহা প্রকৃত পক্ষে রোমীয় স্থাপত্য (Romanesque architecture) হইতে উদ্ভূত। গথিক্ রীতি কালের প্রথম ভাগে ভাঙ্গন স্থাপত্য (Early English style) ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকে। পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সালঙ্কৃত গঠন প্রথা (Decorated style) এর প্রচার ছিল। শেষ ভাগে, খাড়ুগঠন প্রথা (Perpendicular style) এর উৎপত্তি। সূচ্যগ্র তোরণ মালা (pointed arches) গথিক্ রীতির বিশেষত্ব। (Romanesque ও Gothic) রীতি-দ্বয়কে মধ্যযুগের স্থাপত্য রীতি (Mediæval or Christian architecture) বলা হয়।

মুসলমানগণের হস্ত হইতে কেন্সটিনোপল নগরী উদ্ধারার্থ আগত ধর্ম্মযোদ্ধাগণ প্রাচ্য রোম রাজ্যের রাজধানী Byzantine নগরে সৌধ শিল্পের উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিয়া উহাদের অনুকরণে নিজ নিজ দেশে সৌধশিল্পের উন্নতি বিধান করিতে যত্নবান ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগ (Renaisance period) বা নবযুগারম্ভ হয়। গ্রীক্ ও রোমানের সাহিত্য ও ললিত কলার প্রভাবেই এই নবযুগের অভ্যুদয়। সেই সময়ে, গথিক্ স্থাপত্য রীতির সম্বন্ধে গ্রীক্ ও রোমান রীতি প্রবর্ত্তিত হয় এবং এইরূপে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে স্থাপত্য শিল্পের একটী নূতন ধারা প্রবাহিত হয়। Michael Angelo, Gabriel প্রভৃতি এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতীয় ধারা বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

জগতে যত প্রকার স্থাপত্যরীতির প্রচার আছে, তন্মধ্যে গ্রীক ও গথিক্ রীতিদ্বয়কে অপর সকলের আদর্শ বলা যায়—কারণ সকল রীতির মূলতত্ত্ব ঐ দুটীর মধ্যে নিহিত। সেই মূলতত্ত্ব অল্পাধিক পরিমাণে পূর্ণতা লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রীতি মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে কারণে সকলগুলিকেই এক একটী রীতি বিশেষ বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু হিন্দু-রীতি (Hindu styles) সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী—তাহা অন্য কাহারও নিকট ঋণী নহে। জেমস্ ফার্গুসন (James Fergusson) সাহেব বলেন—"বৌদ্ধ স্থাপত্যের অভ্যুদয়ে বিদেশী শিল্পের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু স্থাপত্যশিল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে বিদেশী কোনও শিল্পের ছায়া বা ভিন্ন দেশীয় কোনও রীতির অনুকরণ লক্ষিত হয় না।*"

ভারতীয় স্থাপত্যের বহু দৃষ্টান্ত ভারতের নানা স্থানে এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের চারু কারুকার্য্য ও গঠনসৌন্দর্য্য দর্শকের নয়নতৃপ্তি সাধনে আপনাপন গুণকীর্ত্তন করিতেছে। ফার্গুসন সাহেবের লিখিত স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস (Fergusson's

* "The Buddhist architecture was influenced by foreign styles at its birth. With the Hindu style the case is entirely different. They are all, so far as we know, perfectly indigenous. We can not trace the influence of any foreign style on their origin or any connection with anything outside India during their progress."

History of Architecture) হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত হইল।*

"ভারতবর্ষে পূর্ত্তশিল্প এখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে --" "পূর্ত্তশিল্প-অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে ভারতবর্ষ একটী বিশেষ গবেষণার স্থান। অন্য কোনও দেশে এরূপ বিভিন্ন জাতির বাস নাই ও ইহাদের প্রত্যেকে আপনাপন সভ্যতা ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং ইহা তদ্দ্বারা পূর্ত্তশিল্পে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।"

ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে কতকগুলি অনুপম বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ইহাতে যেমন শিল্পীর অসীম কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই প্রভূত পরিশ্রম ও প্রযত্ন, গঠনের সূক্ষ্মতম অংশে পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইহা অনন্যসাধারণ।... সুতরাং স্থপতি শাস্ত্রে ভারতীয় পূর্ত্তের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট* এবং ইহার অভাবে শাস্ত্রটী অসম্পূর্ণ থাকিত।*

আমি আশাকরি, আমার অন্যতম বন্ধু স্থাপত্য-বিশারদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবেন।

* "Architecture in India is still a living art....." "India affords a singularly favourable field to the Student of Architecture. In no other country of the same extent are there so many distinct nationalities, each retaining its old faith and its old feelings and impressing these on its art."

* ".....for certain qualities, the Indian buildings are unrivalled. They display an exuberance of fancy, a lavishness of labour and elaboration of detail to be found no where else.....They consequently fill up a great gap in our knowledge of the subject which, without them would remain a void

কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ

[শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসি চরণ চন্দ্র]

প্রথম পরিচ্ছেদ

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী যুগে যুগে যে প্রতিফলিত হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। দেখা যায় বাস্তবিক মনুষ্য সমাজের মধ্যে যখনি কোন জাতির কোন বিশেষ অভাব হইয়া জাতি ধ্বংসের মুখে অবতরণ করে, ঠিক সেই সময় সেই জাতিকে পুনরায় আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া কর্ম্মের প্রবাহে ভাসাইয়া তাহার গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার নিমিত্ত সমুদ্র মধ্যস্থ বিপদ-জ্ঞাপক আলোর ন্যায় এরূপ দুই একজন লোক অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, যাঁহাদের উপস্থিতি সেই মৃতকল্প জাতির একমাত্র আশা ও ভরসা ও গর্ব্বের বিষয় হইয়া এবং জাতি তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ক্ষিতিতলে মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইবার অবকাশ পাইয়া থাকে।

এই সকল লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হইয়া পারা যায় না। কারণ দেখা যায় যে তাহার সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক লোকগণ যখন আলস্যে ও কর্ম্মবিমুখতায় মগ্ন, সেই সময় সেই লোকের ভিতর এরূপ কর্ম্ম প্রবাহ কিরূপে উৎসারিত হইয়া উঠিল! দেখা যায় সেই লোক তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সাধকের ন্যায় তন্ময়চিত্তে গভীর কর্ম্ম সাধনায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কুপথগামী জনগণকে বলিতেছেন যে ভ্রান্তপথ ও মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

হতভাগ্য জাতি সেই সময় দারুণ মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকার দরুণ তাঁহার বাক্য অবহেলা করে কিন্তু কিছু দিবস অন্তে তাঁহাকেই তাহাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে। ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম।

এই কারণে প্রথমে প্রভু যীশুখৃষ্ট ক্রুশে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহারাই সেই ভ্রান্ত জনগণের উপাস্যরূপে তাহাদের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া রহিয়াছেন।

এই কর্ম্ম-সাধকগণের চরিত্রবল ও মানসিকবল অতি অদ্ভুত। শ্মশান মধ্যস্থ শব-সাধকের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী বিভীষিকাকে তাচ্ছিল্যভরে অবহেলার ন্যায় ভ্রান্তজনগণের নিন্দা কিম্বা স্তুতিকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মসাধনার আদর্শ রক্ষা করেন।

আজ বাঙ্গালী জাতি তাহার কর্ম্মশক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া আলস্য সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে,

পথ

শ্রীসন্তোষ চরণ চক্রের সৌজন্যে

ক্রমে ক্রমে সে তাহার সমস্তই প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার ব্যবসা বাণিজ্য নাই—সকলই পরহস্তগত। বাঙ্গালী কেবল পরের দ্বারে দাসত্ব করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এই দাস-মনোবৃত্তির মধ্যে—এরূপ একজনকে দেখা যাইতেছে যিনি তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থাকে দূরে অপসারিত করিয়া সম্পর্কে মস্তকোত্তোলন করিয়া জগতের মনুষ্য সমাজে বাঙ্গালী জাতির কর্ম্ম-শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপে দণ্ডায়মান। তাঁহার কার্য্য হইতে দেখা যায় যে কর্ম্মের দ্বারা, সাধনের দ্বারা, মহান চরিত্রবলের দ্বারা কিরূপে সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চতম অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায়। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সাধনা করিলে জয়লক্ষ্মী তাহার গলে জয়মাল্য অর্পন করিবেন, তাহার অন্যথা নাই। ইনিই কর্ম্মবীর রাজেন্দ্রনাথ।

১২৯১ সালের ১০ই আষাঢ়, শুক্রবার, ইংরাজী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, ২৪শে জুন, রথযাত্রার দিবস ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ভ্যাবলা গ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে রাজেন্দ্রনাথ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাতা ৺ব্রহ্মময়ী দেবী। রাজেন্দ্রনাথের পরিচয় প্রদানের পূর্ব্বে তাঁহাদের বংশের কিছু পরিচয় প্রদান আবশ্যক। কারণ এই মুখোপাধ্যায় বংশ বঙ্গ-দেশের মধ্যে আদর্শ ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রথমতঃ ইঁহারা এতৎপ্রদেশে অতি সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া চিরপরিচিত। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় ইঁহাদের নিকট নতশির এবং ইহা ব্যতীত ইঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বহুপুরুষ পর্য্যন্ত এখনও একান্নবর্ত্তী থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর উন্নতি করিতেছেন। বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য প্রভাবে এখনও তাঁহারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নাই। ইঁহাদের আদি পুরুষ বলরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইখানে মাতামহ আলয়ে আসিয়া বাস করেন তৎপরে আজ প্রায় পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী অবস্থায় বসবাস করিতেছেন এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ। বঙ্গদেশের মধ্যে এরূপ একতাসম্পন্ন পরিবার অদ্যকাল দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাজেন্দ্রনাথের পিতা ভগবান চন্দ্রের দুই বিবাহ। রাজেন্দ্র নাথ প্রথমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান। যে সময়ে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার পিতার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তিনি তৎকালে বারাসাতে ৺কানাইলাল ঠাকুরের মোক্তার ছিলেন এবং রাজেন্দ্রনাথের জোষ্ঠতাত মহেশ চন্দ্র বারাসাত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, ট্রেজার, ইডেন প্রভৃতির নিকট সেরেস্তার ছিলেন। তৎকালে এই সেরেস্তার কার্য্য অতি সম্মানিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এক্ষণে বারাসাত জেলা উঠিয়া ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার বিভক্ত হইয়াছে। তৎকালে বারাসাতে তিনটী মহকুমা ছিল। বারাসাত, ডায়াণ্ডনিয়া ও কল্যাণেরায়া। বারাসাতে তৎকালে মুখোপাধ্যায় পরিবারের একটী বাসা ছিল এবং ইঁহাদের বাটীর প্রায় সকল বালক বারাসাতে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আগমন করিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাজেন্দ্রনাথের পিতা ভগবান চন্দ্রের দুই বিবাহ কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে তাঁহার ৪টী বিবাহ ছিল। প্রথম দুই পত্নী পর পর গতাসু হইবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে আরও দুইটী বিবাহ করেন। প্রথমে বাদুড়িয়া গ্রামে ৺অশোক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবী এবং ইছাপুর গ্রামে ইচ্ছাময়ী দেবী নাম্নী আর একটী কন্যা। রাজেন্দ্র নাথ এই অশোক চন্দ্রেরই দৌহিত্র। অশোক চন্দ্রের তিন পুত্র ঋষিকানাথ, আনন্দচন্দ্র ও কার্ত্তিকচন্দ্র। রাজেন্দ্রনাথের মাতামহ বংশ অতি তেজস্বী স্বাধীনচেতা এবং সাধকবংশ বলিয়া চিরপরিচিত। বোধ হয় রাজেন্দ্র নাথের এই জীবন সংগ্রামে স্বাধীনতা স্পৃহা,

অদম্য সাহস, উৎসাহ ও অফুরন্ত কর্মশক্তি তাঁহার মাতৃধারা হইতে প্রাপ্ত এবং সংজ্ঞান, দয়া, শিক্ষা প্রভৃতি তাঁহার পিতৃধারা হইতে প্রাপ্ত। কারণ দেখা যায় তাঁহাদের পরিবারের প্রত্যেক পুরুষই শিক্ষিত। শিক্ষার চর্চ্চা তাঁহাদের বংশের একরূপ কৌলিক ধারা রূপেই বর্ত্তমান।

রাজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অধিক বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা মাতার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

রাজেন্দ্রনাথের পিতা ভগবানচন্দ্রের প্রকৃতি অতি উদার ও মহৎ ছিল। তৎকালে ঐ প্রদেশে ভগবান চন্দ্রের ন্যায় পরদুঃখকাতর, দয়ালু, সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবাদ আছে যে ভগবানচন্দ্র অতি ন্যায়বাদী ও পক্ষপাত-শূন্য ব্যক্তি ছিলেন। সেই কারণে তৎকালে লোকের বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিবার জন্য সকলেই ভগবান চন্দ্রের উপর নির্ভর করিত। তৎকালে আদালতে বিচার প্রার্থী কম লোকেই হইত। সকলেই গ্রাম্য মাতব্বর ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া সন্তুষ্ট হইত। ভগবানচন্দ্র ধার্ম্মিক, সুবিচারক ও পক্ষপাত-শূন্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া গ্রামে আগমন করিলে এই সমস্ত বিচার নিষ্পত্তি করিতে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। অনেক সময়ে তিনি স্নানাহারের সময় পাইতেন না। শুধু যে ভ্যাবলা গ্রামের লোক তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত তাহা নহে। বহুদূরবর্ত্তী গ্রামের লোক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া লইত। এমন কি, তৎকালে ঐ প্রদেশের জমিদার এবং বড়মর, টাকী কিম্বা সাতক্ষীরা জমিদারদিগের মধ্যে কোন সালিশী বিচার আবশ্যক হইলে তাঁহারা অতি সম্মানের সহিত ভগবান চন্দ্রকে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতেন। এই মুখোপাধ্যায় বংশ অতিথি সৎকারের জন্য ঐ প্রদেশে চির-প্রসিদ্ধ, তাহার উপর ভগবান চন্দ্র ঐ বংশে দাতাবর্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পরে এই ভগবান চন্দ্র সম্বন্ধে আরও বিশেষ বর্ণিত হইবে।

রাজেন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী ব্রহ্মময়ী স্বামীর উপযুক্তা পত্নী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুগৃহিণী ও দয়াবতী রমণী সংসারে বিরল। তাঁহার পরিচালনায় এতবড় বৃহৎ পরিবারের মধ্যে কোনও রূপ মনোমালিন্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার সদ্বিবেচনার কথা এখন এদেশে প্রবাদবাক্য রূপে পরিণত হইয়াছে। তিনি গৃহের গৃহিণী ছিলেন। গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে কিরূপে সম্পাদন করিতে হয় তাহা বোধ হয় ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বাটীর সকলের, নিদ্রোত্থানের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন ও সকলে শয্যাগ্রহণ করিলে পরে তিনি শয্যাগ্রহণ করিতেন এবং বাটীর সকলের আহারাদির পর তিনি আহার গ্রহণ করিতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার অসীম দয়া। প্রতিবেশী মণ্ডলের মধ্যে কোন ব্যক্তি অভুক্ত থাকিলে ব্রহ্মময়ী তাহাকে আহার দানে তৃপ্ত না করিয়া নিজে আহার গ্রহণ করিতেন না। ইঁহারও বিস্তৃত পরিচয় পরে প্রদান করা হইবে।

রাজেন্দ্রনাথ বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপরে তাঁহার বয়স যখন ৪।৫ বৎসর তখন তাঁহার পিতা-ঠাকুর তাঁহাকে বারাসাতে নিজের নিকট লইয়া আসেন। এখানে তিনি সাত আট বৎসর বয়স অবধি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহেশচন্দ্রও পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহাদের বারাসাতের বাসা উঠিয়া যায় ও সকলেই পুনরায় ভ্যাবলা গ্রামে প্রত্যাগমন করেন এবং পুনরায় বাঙ্গালা পাঠশালায় শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু

রাজেন্দ্রনাথের হৃদয় বাল্য হইতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাপ্তি এবং বাল্য হইতেই যেন তিনি আত্মোন্নতির উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। জগতে দেখা যায়, যাহারা আত্মোন্নতির জন্য সদাচ ব্যস্ত নহে তাহারা কখনই উন্নত হইতে পারে না। রাজেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এ যুগে কিছু উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী শিক্ষা আবশ্যক। তাই তিনি সেই বালক বয়সে বারাসত হইতে আগমন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। তিনি সকলের নিকট বলিলেন যে তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিবেন। কিন্তু তৎকালে দেশে কোন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না। যাঁহারা দুই একজন ইংরাজী জানিতেন তাঁহারা বিদেশে কোন উচ্চ চাকুরী লইয়া গমন করিয়াছেন এবং বিদেশেই অবস্থান করেন।

কোন ইংরাজী বিদ্যালয়ও তৎকালে ও প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই কারণে তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার কোন উপায় ছিল না। এদিকে কিন্তু বালক রাজেন্দ্রনাথের অদম্য আত্মোন্নতির চেষ্টায় ইংরাজী শিখিবার একান্ত আগ্রহে আত্মীয়গণের মধ্যে সকলেই বুঝিলেন যে বালকের এই অদম্য উৎসাহকে কিছুতেই দমিত করা যাইবে না তখন সকলেই তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইলেন।

অনেক অনুসন্ধানে তাঁহারা জানিতে পারিলেন তাঁহাদের, খুলনা জেলায় কালীগঞ্জের নিকট কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, সেখানে তাঁহাদের অধীনে জনৈক গুরুমহাশয় সামান্য ইংরাজী ভাষা জানেন এবং তিনি বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই কথা শ্রবণে রাজেন্দ্রনাথ সেই আট বৎসর বয়সেই মাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তথায় তাঁহার খুল্লতাত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৎসরের অধিকাংশ সময় অবস্থান করিয়া সেই সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের এই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে রাজেন্দ্রনাথকে লইয়া চলিলেন। সেই স্থানে গমন করিতে হইলে বড় বড় নদীর উপর দিয়া গমন করিতে হয়। রাজেন্দ্রনাথকে সে সম্বন্ধে ভয় দেখান হইয়াছিল কিন্তু আলস্যবিমুখ উন্নতাকাঙ্ক্ষী সাহসী বালক কিছুতেই তাহাতে ভীত হইল না। তাঁহার এই একাগ্রতা, এই কর্মনিষ্ঠতাই বোধ হয় পরিশেষে তাহাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়াছিল। এবং দেখা যায় জগতে যাহারা উন্নত হইয়াছে, এই একাগ্রতাই তাহাদের মূল উপাদান। বোধ হয় এইজন্যই বালক ধ্রুবকে কেহই তাহার সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

কালীগঞ্জে আগমনের পর বালক রাজেন্দ্রনাথ অতি অভিনিবিষ্ট চিত্তে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে খুল্লতাতের সহিত বাটীতে আগমন করিয়া মাতা প্রভৃতিকে দেখিয়া যাইত। কিন্তু এখানে তাহার অধিক দিবস থাকা হইল না। এখানে একবৎসর আন্দাজ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা হইলে তৎকালে এতদ্দেশে প্রচলিত "বাঙ্গালা টিকা" (বসন্ত রোগের প্রতিষেধক; এক্ষণে যেরূপ প্রণালীতে টিকা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে তৎকালে এরূপ প্রণালী ছিল না ইহা অপেক্ষা কঠিন ছিল তাহাকে "বাঙ্গালা টিকে" বলা হইত) সেই টিকা দেওয়া হয়। সেই টিকা দেওয়ায় অত্যন্ত জ্বর হয় এবং সেই জ্বর ক্রমশঃ কঠিনতর অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়। তখন বালক রাজেন্দ্রনাথকে সেই জীবন মরণ সমস্যা অবস্থায় কালীগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে পুনরায় ভাবনার বাটীতে আনয়ন করা হয়। ভাবনায় আনয়নের পর নানারূপ চিকিৎসা এবং পরিচর্য্যায় তিনি আরোগ্য লাভ করিতে থাকেন এবং ইহা ছাড়া তৎকালে কালীগঞ্জের জলবায়ু সোনা থাকায় বালক রাজেন্দ্রনাথের পক্ষে

বিশেষ উপযুক্ত ছিল না। তাহাতেও তাহার শরীর ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে।

সেই টিকা দেওয়া ব্যাপার হইতে আরোগ্য লাভ করিলে বাটীর সকলে আর তাঁহাকে কাশীধামে পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী। কারণ তিনি মাতার একমাত্র সন্তান। যদিও তাঁহার আর একটী ভগ্নী আছে, তাহা তাঁহার বিমাতা ইচ্ছাময়ী দেবীর গর্ভসম্ভূতা।

রাজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। যদিও তাঁহার উন্নতির প্রথমস্তরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল কিন্তু পরে তিনি তাঁহার বিমাতাকেই নিজ গর্ভধারিণী মাতার স্থানে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকেই মাতৃসম্মানে সম্মানিতা করিয়া তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা করিয়াছেন। তাঁহার কন্যাকে নিজ সহোদরার স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। উত্তরকালে রাজেন্দ্রনাথ ধনী হইয়া কখনই এই বিমাতার সেবায় পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

রাজেন্দ্রনাথ ধনী হইলে তিনিই তাঁহার বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী হয়েন। পরে তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার ইচ্ছায় বিমাতাকে কাশীধামে সুখে অবস্থান করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাত আট বৎসর হইল তিনি তথায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া পুত্রের সমস্ত কর্ত্তব্যই সম্পাদন করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রাজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মাতৃভক্ত বালক। কিন্তু দেখা যাইত তাঁহার আত্ম কর্ত্তব্য জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা উপরে আছে। তিনি এখনও পর্য্যন্ত জানেন যে পুরুষের কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে কোন কার্য্যই করা হয় না। বালক ধ্রুবও মাতৃভক্ত ছিলেন। সেই অত্যধিক মাতৃভক্তিই তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। তিনি মাতৃভক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া মাতাকে সুখী করিবার জন্য মাতাকেই পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ ও ভাহাই; তিনি বালক বয়স হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পিতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে সংসারের অমঙ্গল অবস্থা আগমন করিয়াছে; একান্নবর্ত্তী বৃহৎ সংসারকে প্রতিপালন করিয়া রক্ষা করিতে হইবে। যাহাতে মাতা বিমাতা প্রভৃতি দারিদ্র্য যন্ত্রণা না প্রাপ্ত হন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে হইবে না। দেখা যাইত, বাল্য হইতেই তাঁহার মধ্যে উন্নতির চেষ্টা ও ইচ্ছা। এবং সেই ইচ্ছাকে কখনই তিনি চাপিয়া রাখেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির ভিতর উন্নতির চেষ্টা এবং ইচ্ছা যে নাই তাহা নহে কিন্তু এরূপ জাড্য ও আলস্যতা এই জাতিকে আক্রমণ করিয়াছে যে সেই চেষ্টা এবং ইচ্ছা দারুণ আলস্যতার চাপে চূর্ণ হইয়া যায় তখন উপরে বর্ত্তমান থাকে কেবল নৈরাশ্য আর দারিদ্র্য।

কিন্তু রাজেন্দ্রনাথকে সেই আলস্যতা কখনই জয় করিতে পারে নাই। তিনিই বাল্য হইতে আলস্যকে জয় করিয়াছিলেন। তাই বোধ হয় আজ তিনি বাঙ্গালী জাতির ব্যবসাক্ষেত্রে মুখ রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন।

যে দিন এই বাঙ্গালী জাতি তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দারুণ আলস্যের চাপ, দারুণ চাকরীর বোঝা ত্যাগ করিয়া পুনরায় কর্ম্ম সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতে পারিবে তখন হইতে এই বাঙ্গালী জাতি পুনরায় ব্যবসায়ী জাতিরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীর ধনাগার হইতে ধন আহরণ করিয়া বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে নচেৎ নহে।

(ক্রমশঃ)

তাপ

[শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়]

শক্তির নানারূপ বিকাশ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে "তাপ" অন্যতম। প্রচলিত ভাষায় অগ্নি "উত্তপ্ত" ও বরফ "শীতল" বলিয়া আমরা উক্ত তাপ-শক্তির মাত্রা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি।

কোন বস্তুতে তাপ শক্তির বিকাশ, বৈজ্ঞানিক ভাষায় বস্তুটীর "উত্তাপ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বস্তুটীতে নিহিত তাপ শক্তির ব্যক্ত-ফল, বস্তুটীর "উত্তাপ"। বস্তুটীকে স্পর্শ করিয়া উহা "উষ্ণ" বা "শীতল" ইহা বোধগম্য হইলেও উত্তাপের ঈষৎ তারতম্য আমাদের অনুভূতির গোচর নহে। বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম ভাবে উত্তাপ-নির্ণয় ও পরিমাপের জন্য "তাপমান" যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১নং চিত্র)।

তাপ যোগে সকল বস্তুরই আয়তন বর্দ্ধিত হয়। এই ধর্ম্ম অবলম্বনে তাপমান-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। একটী সূক্ষ্ম-ছিদ্র কাচনলের একপ্রান্তে স্থূলতর আধার গঠিত হয়। নলটীতে 'পারদ' নামে তরল ধাতু সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে পারদপ্রান্ত আধারটি পূর্ণ করিয়া সূক্ষ্মছিদ্র পথেরও কিছুদূর অবস্থান করে।

উক্ত যন্ত্রের আধারটিতে, তাপযোগে আধারস্থ পারদ উত্তপ্ত হইয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যন্ত্রের কাচও আয়তনে বৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু পারদের বৃদ্ধি কাচের বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক হওয়ায় সূক্ষ্ম-ছিদ্র পথে আধারের বিপরীত মুখে পারদ সীমা অগ্রসর হইতে থাকে। পারদ সীমার অবস্থান উত্তাপের মাত্রা নির্দ্দেশ করে। মূলতঃ ইহাই তাপমান যন্ত্র।

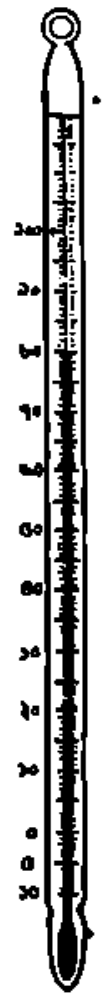

১নং চিত্র—তাপমান যন্ত্র।

একটি পাত্রে কিছু বরফ চূর্ণ রাখিয়া, চূর্ণের ভিতর যন্ত্রটীর আধার নিবিষ্ট হয়, যন্ত্রটীতে পারদসীমা আধারাভিমুখে অবতরণ করিয়া অবশেষে স্থির হইলে উহার অবস্থান যন্ত্রটীর গায়ে চিহ্নিত হয়। পরে যন্ত্রটী

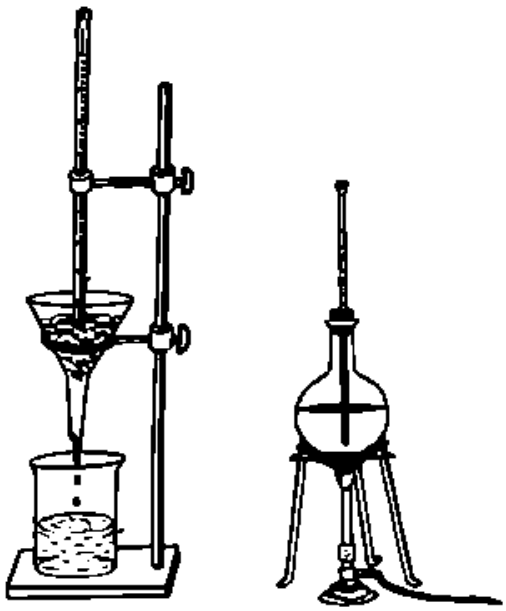

ফুটন্ত বিশুদ্ধ জলের উপর রাখিতে হয় এবং উদ্গত বাষ্প সংস্পর্শে উহার পারদ সীমা অগ্রসর হইয়া অবশেষে স্থির হইলে বন্ধুবাহে উহার অবস্থানানুযায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হয়। (২ ও ৩নং চিত্র)

বিজ্ঞানে প্রচলিত (সেন্টিগ্রেড্) প্রথানুসারে উপরোক্ত চিহ্নদ্বয়ের ব্যবধান একশত সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে ও এক একটী বিভাগ অনুযায়ী উত্তাপ এক "ডিগ্রী" (১°) বলিয়া ব্যক্ত হয়। ফুটন্ত জলবাষ্পের উত্তাপ একশত ডিগ্রী। ইহার উর্দ্ধেও উপরোক্ত বিভাগানুযায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকে। বরফ দ্রব বিগলিত হইবার সময় উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী (0 সেঃ)। ইহার নিম্নমাত্রা উত্তাপ, বিযুক্ত চিহ্নে (—) ব্যক্ত হয়। যথা — ৭° ডিগ্রী সেঃ উত্তাপ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা 0 সেঃ হইতে ৭° পরিমাণ নিম্ন।

মানব দেহের উত্তাপ পরিমাপের জন্য

প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথায় বরফের সংস্পর্শে পারদসীমার অবস্থান, ৩২ ও ফুটন্ত জলবাষ্প সংস্পর্শে ২১২ ডিগ্রী ধার্য্য হইয়া থাকে। উভয় চিহ্নের অন্তর ১৮০ সমান ভাগে বিভক্ত, এবং উপরোক্ত চিহ্নদ্বয়ের উর্দ্ধে ও নিম্নে উক্ত বিভাগানুযায়ী চিহ্ন অঙ্কিত থাকে।

উক্ত দুই প্রথা ব্যতীত "রয়মার" নামে অপর একটী প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। ইহাতে গলনোন্মুখ বরফের উত্তাপ 0° ও ফুটন্ত জলবাষ্পের উত্তাপ ৮০° ধার্য্য হইয়া থাকে। এক্ষণে রাশিয়া ব্যতীত কোথাও এ প্রথার প্রচলন নাই

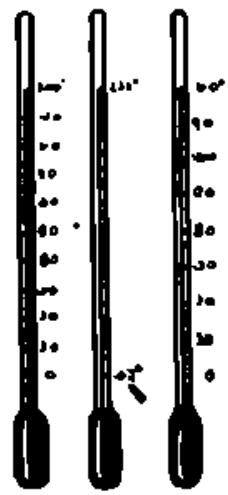

সেন্টিগ্রেড্ ফারেনহাইট্ রয়মার

৪নং চিত্র।

যে কোন প্রথায় উত্তাপ ব্যক্ত হইলে পর অন্য প্রথায় উহার মাত্রা সহজেই নিরূপিত হইতে পারে। এই জন্য নিম্নলিখিত সম্বন্ধটী ব্যবহার্য্য :—

$$\frac{\text{সেন্টিগ্রেড্}}{১০০} = \frac{\text{ফারেনহাইট্} - ৩২}{১৮০} = \frac{\text{রয়মার}}{৮০}$$

আমাদের শরীরের সাধারণ অবস্থায় উত্তাপ ৯৮

ইহার মাত্রা সেন্টিগ্রেড্ প্রথানুক্রমে

$\frac{৯৮-৩২}{১৮০} \times ১০০ = ৩৬·৬^{\circ}$ বায়ুমণ্ডলের

উত্তাপ ও সচরাচর কার্বনাইটে ব্যক্ত হইয়া থাকে। কলিকাতায় গ্রীষ্মকালে ১১০° ফাঃ পর্য্যন্ত, (অর্থাৎ ৪৩·৩ সেঃ) ও শীতকালে ৬০° ফাঃ অর্থাৎ ১৫·৫ সেঃ পর্য্যন্ত উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। • মরুভূমিতে উত্তাপ ১৪০° ফাঃ হইতে পারে। মেরুপ্রদেশের উত্তাপ কখনও কখনও —২০° ফাঃ পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়া থাকে।

বস্তুর উত্তাপ হইতে উহার তাপশক্তির সম্পূর্ণ পরিমাণ হয় না। উত্তাপ, বস্তুটীর উপর তাপশক্তির প্রকাশ ও অভিব্যক্তি মাত্র। দুইটি বিভিন্ন ভারযুক্ত ও একই দ্রব্য নির্ম্মিত বস্তু, একত্রে একই উপায়ে উত্তপ্ত হইলে। সুতরাং উভয়ে একই পরিমাণ তাপ-শক্তি যোগে) উহাদের উত্তাপ বৃদ্ধি ভারের বিপরীতানুপাতী হইয়া থাকে। অর্থাৎ একগ্রাম ভারযুক্ত বস্তু যে পরিমাণ তাপ যোগে ২° সেঃ উত্তাপ বৃদ্ধি লাভ করে, দুই গ্রাম ভারযুক্ত বস্তু তাহার সমান পরিমাণ তাপ যোগে ১° সেঃ মাত্র উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও বস্তু দুইটী একই দ্রব্য নির্ম্মিত কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং তাপ = ভার × উত্তাপ।

উচ্চতর উত্তাপযুক্ত বস্তু হইতে, তাপ নিম্নতর উত্তাপযুক্ত সংলগ্ন বস্তুতে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে তাপ, প্রথমোক্ত বস্তুটীতে শেষোক্তটীর অপেক্ষা অল্পতর হইলেও তাপ সঞ্চালনের কোন ব্যতিক্রম হয় না। এইরূপ ক্রমশঃ উভয় বস্তুর উত্তাপ সমান হইলে, তাপ প্রচলন বন্ধ হয়। দুইটী জলপূর্ণ পরস্পর সংলগ্ন পাত্রের একটী অপরটী হইতে উচ্চে অবস্থিত হইলে, উচ্চতর পাত্রে জলের পরিমাণ অল্প হইলেও উহা নিম্নস্থ পাত্রে প্রবাহিত হইবে। "উত্তাপ" উক্ত উদাহরণে পাত্রটীর উচ্চতার সহিত তুলনীয়। তাপ জলের পরিমাণের সহিত তুলনীয়।

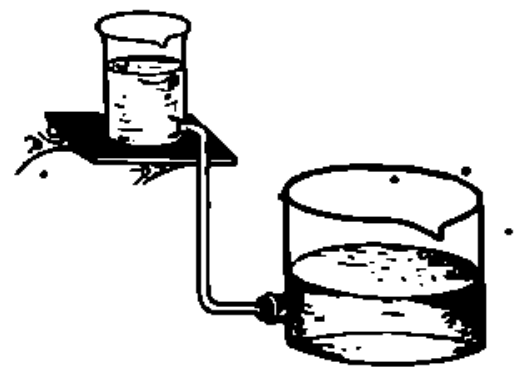

দুইটী বিভিন্ন দ্রব্য নির্ম্মিত সমভার বস্তু একত্রে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত হইলে দেখা যায় যে, উভয়ের উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। যে পরিমাণ তাপ যোগে বস্তুর উত্তাপ ১° সেঃ মাত্র বর্দ্ধিত হয়, তাহা বিভিন্ন দ্রব্যে বিভিন্ন, ইহার পরিমাণ বস্তুটীর আকৃতি, আয়তন, ভার ইত্যাদি ধর্ম্মের অতীত; কিন্তু দ্রব্যটীর স্বরূপ ভেদে ইহার পরিমাণ ভেদ হয়। উক্ত পরিমাণকে দ্রব্যটীর "তাপ-গ্রাহীতা" বলা হইবে।

অর্থাৎ এক গ্রাম ভারবিশিষ্ট একটী দ্রব্য যে পরিমাণ তাপপ্রয়োগে ১ সেঃ উত্তাপ বৃদ্ধি লাভ করে, তাহা দ্রব্যটীর "তাপগ্রাহীতা"। সুতরাং একটী "ভ" গ্রাম ভারযুক্ত বস্তু ত° সেঃ উত্তাপ বৃদ্ধি লাভ করিলে প্রযুক্ত তাপ শক্তির পরিমাণ = ভ × ত × "তা"। ("তা" চিহ্ন দ্রব্যটীর তাপ-গ্রাহীতা ব্যক্ত হইয়াছে)।

পরীক্ষা কালে উত্তাপের তারতম্যেও দ্রব্যের তাপগ্রাহীতা বিভিন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে তালিকায়

কতকগুলি দ্রব্যের বিভিন্ন উষ্ণতায় তাপগ্রাহীতার পরিমাণ প্রদত্ত হইল :

দ্রব্য	উষ্ণতা	তাপগ্রাহীতা
জল		
ঐ		
মোম		
তাম্র		
রজত		
লৌহ	সেঃ	
পারদ		

তালিকাদৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে যে ১৫° সেঃ উষ্ণতায় বিশুষ্ক জলের তাপগ্রাহীতা তুলনামূলক ধরা হইয়াছে। এক গ্রাম বিশুষ্ক জল ১৫° সেঃ হইতে ১৬ সেঃ মাত্রায় উত্তপ্ত হইলে প্রযুক্ত তাপের পরিমাণকে "এক-ক্যালোরী" বলা হয়। ইহাই বিজ্ঞান-গ্রাহ্য পরিমাণ। ইংলণ্ডে স্থূলতর পরিমাণের জন্য ১ পাউণ্ড জলের ১ ফঃ উষ্ণতা সাধনে প্রযুক্ত তাপের পরিমাণকে ১ B.T.U. বলা হইয়া থাকে। সুতরাং ১০০ গ্রাম জল 0° সেঃ হইতে ১০০ সেঃ উষ্ণতায় আনীত হইলে তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ=১০০ × ১০০=১০,০০০ ক্যাঃ। গ্রাম জল ১ সেঃ মাত্র উত্তপ্ত হইলেই উক্ত পরিমাণ তাপশক্তি লাভ করে।

১০০ গ্রাম জল ১০০° সেঃ উষ্ণতায় ও ১০০ গ্রাম জল 0 সেঃ একত্রে মিশ্রিত হইলে মিশ্রণের উষ্ণতা ৫০° সেঃ হইয়া থাকে, কিন্তু ১০০ গ্রাম তাম্র ১০০° সেঃ আনীত হইয়া ১০০ গ্রাম 0 সেঃ উষ্ণতা বিশিষ্ট জলে নিমজ্জনের পর উভয়ের উষ্ণতা ৯ সেঃ মাত্র হইবে। জল ও তাম্রের বিভিন্ন তাপগ্রাহীতার জন্য উক্ত রূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় (৬নং ও ৭নং চিত্র)।

কোন দ্রব্যের তাপগ্রাহীতা নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ বস্তুটীকে একটী নিরূপিত উষ্ণতায় আনয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ একটী পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করা হয়। জলটীর ভার ও উষ্ণতা পূর্ব্বেই পরিমিত হইয়া থাকে। নিক্ষেপের পর তাপমানে উষ্ণতা বৃদ্ধি সূচিত হইবে, এবং ক্রমে উষ্ণতা স্থির হইলে উহা লিপিবদ্ধ হয়।

বস্তুটীর ভার 'ম' গ্রাম; উষ্ণতা ৩,° সেঃ, জলের ভার 'ভ' গ্রাম ও উষ্ণতা ত, সেঃ। শেষ

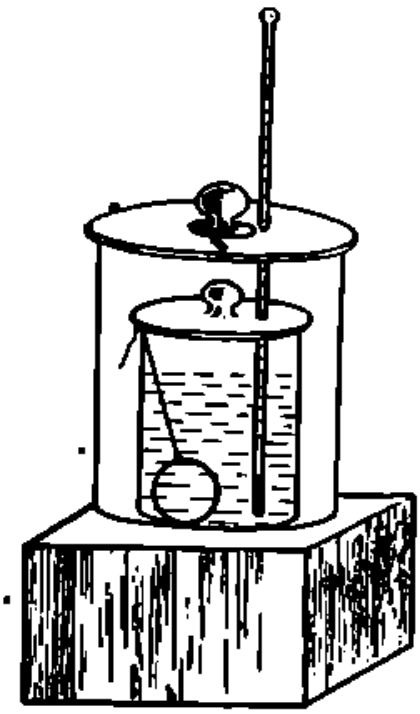

৬নং চিত্র - ক্যালোরীমান

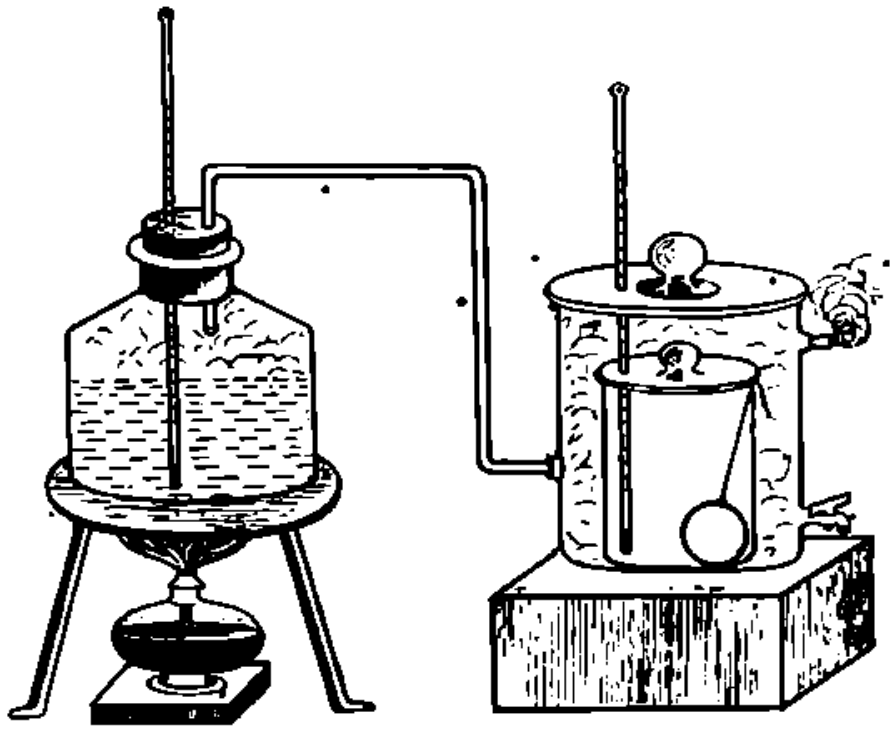

৭নং চিত্র—আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ।

উত্তাপ $ত_১$ সেঃ; তাপগ্রাহীতা "তা" ক্যালোরী বলাক্রমে ধার্য্য হইলে, জলের তাপ বৃদ্ধি $= ভ \times (ত_২ - ত_১)$ ক্যালোরী। বস্তুটীর তাপ হ্রাস $= স (ত_২ - ত_১) \times তা$। এই দুইটী পরিমাণ অবশ্য সমান।

সুতরাং $ভ \times (ত_২ - ত_১) = স \times (ত_২ - ত_১) \times তা$

$$তা = \frac{ভ \times (ত_২ - ত_১)}{স \times (ত_২ - ত_১)}$$

কার্য্যকালে দেখা যায় যে, যে পাত্রে উক্ত পরীক্ষা নির্ব্বাহ হয়, তাহাও কিছু তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার পরিমাণ পরীক্ষার পূর্ব্বে নিরূপিত হয়। উপরের উদাহরণে পাত্রটীর ভার 'ভ' গ্রাম ও উহার দ্রব্যের তাপগ্রাহীতা তা, ধার্য্য হইলে পাত্রের তাপ গ্রহণের পরিমাণ $= ত$

বস্তুটী হইতে

সমষ্টি। সুতরাং

$\times ত + ভ_১ \times তা_১ (ত_২ - ত_১)$

$$\therefore তা = \frac{ভ \times (ত_২ - ত_১) - ভ_১ \times (ত_২ - ত_১) \times তা_১}{স \times (ত_২ - ত_১)}$$

$$= \frac{(ত_২ - ত_১) \times (ভ - ভ_১ \times তা_১)}{স \times (ত_২ - ত_১)}$$

তরল বস্তুর তাপগ্রাহীতাও অনুরূপ পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়া থাকে। এই সকল পরিমাণের জন্য সাধারণতঃ তাম্র নির্ম্মিত হয়। ইহাদের "ক্যালোরীমান" বলা হইবে।

তাপ প্রয়োগে বস্তুর প্রসার।

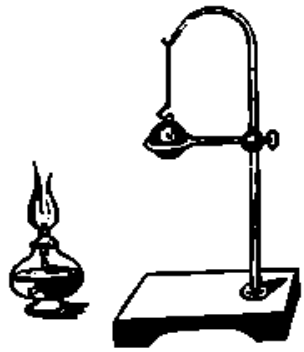

৮নং চিত্র।

সকল বস্তুই উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও বেধে প্রসারিত হয়। সুতরাং আয়তনেও প্রসারিত হয়। ইহা দ্রব্যটীর একটী মূল ধর্ম্ম ও আকৃতি-আয়তনাদির অতীত। চিত্রানুযায়ী পরীক্ষায় লৌহ বা তাহা-নির্ম্মিত দণ্ডের তাপ-প্রয়োগে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সূচিত হইয়া থাকে।

একটী লৌহ নির্ম্মিত বলয় ও সমান ব্যাস বিশিষ্ট একটী গোলক গ্রহণ করা হইল। গোলকটী স্বভাবতঃ ছিদ্র পথে গমনাগমন করিতে পারে না। এক্ষণে অঙ্গুরী উত্তপ্ত হইলে পর দেখা যাইবে যে গোলকটী অনায়াসেই ছিদ্র পথে প্রবিষ্ট হইবে।

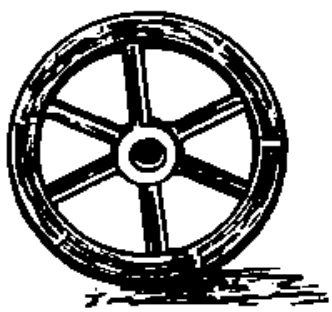

৯নং চিত্র—শকট চক্র।

তাপ যোগে বস্তুর প্রসার ও তাপহরণে উহার সঙ্কোচ এই ধর্ম্ম অবলম্বনে শকটাদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত চক্রের উপরে ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে, লৌহ চক্র সংলগ্ন হইয়া থাকে। লৌহ চক্রটীর ব্যাস ও কাষ্ঠ চক্রটীর ব্যাস সমান অথবা প্রথমোক্তটী সামান্য পরিমাণে অল্পতর গঠিত হয়। তাপ যোগে লৌহ চক্রের ব্যাস বর্দ্ধিত করিয়া উহা অপরটীর উপর যথা স্থানে সজ্জিত হয়। পরে শীতল জল সিঞ্চনে, লৌহ সঙ্কুচিত এবং উহার ফলে কাষ্ঠের উপর দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া থাকে (৯নং ও ১০নং চিত্র)।

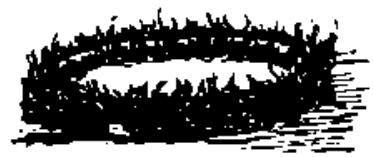

১০নং চিত্র—লৌহ চক্র উত্তপ্ত করা হইতেছে।

কামান নির্ম্মাণের জন্যও উক্ত ধর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। উহা মূলতঃ কতকগুলি পরস্পর সংলগ্ন-সিলিণ্ডারের সমষ্টি। প্রথম সিলিণ্ডারটীর আভ্যন্তরিক ব্যাস ও দ্বিতীয়টীর আভ্যন্তরীণ ব্যাস প্রায় সমান গঠিত হয়। তাপ যোগে দ্বিতীয় সিলিণ্ডারটী প্রসারিত করিয়া উহাকে প্রথমটীর উপরে যথাস্থানে সজ্জিত করা হয়। পরে জল সিঞ্চনে শীতল হইয়া সঙ্কোচনের ফলে উভয়ে দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ প্রয়োজনানুযায়ী দীর্ঘ কামান নির্ম্মিত হয়। আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই উপায় প্রচলিত আছে।

রেলের লাইনে সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে দুই খণ্ড রেলের সংযোগ স্থলে কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে। প্রবল গ্রীষ্মের সময়, রেল দৈর্ঘ্যে বর্দ্ধিত হয়। উক্ত প্রকার ব্যবধান না থাকিলে প্রসারণে বাধা পাইয়া প্রবল চাপের সৃষ্টি হইবে ও রেলের স্থানচ্যুতি

ঘটিবে। সেতু প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত সকল গঠনেই বিভিন্ন অংশের অবাধ প্রসারণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

একডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ মাত্রা উত্তাপ বৃদ্ধি ফলে কোন দ্রব্যের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি-পরিমাণ ও উহার মূল দৈর্ঘ্যের অনুপাত সংখ্যাকে দ্রব্যটীর "দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিহার" বলা হইবে। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিহার $= \frac{\text{দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি}}{\text{মূল দৈর্ঘ্য}}$

নিম্নে তালিকায় কতকগুলি দ্রব্যের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধিহার প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখা যাইবে যে বিভিন্ন দ্রব্যে উহার পরিমাণ, ন্যূনাধিক দশ ভাগের দুই ভাগ মাত্র।

দ্রব্য	দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিহার
প্লাটিনাম্	০·০০০০৮৮৭
তাম্র	০·০০০০১৭৭৮
ইস্পাত	০·০০০০১০২৫
দস্তা	০·০০০০২৯১৮
পিত্তল	০·০০০০১৮৭
কাচ	০·০০০০৮৩
কাষ্ঠ	০·০০০০৫৪

কোন দ্রব্যের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধিহার="হ" দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি ="বৃ"; মূল দৈর্ঘ্য="দৈ" ও উত্তাপ বৃদ্ধি="ত" সেঃ ধার্য্য হইলে, বৃ=দৈ+(ত × হ)।

∴ বর্দ্ধিত দৈর্ঘ্য=দৈ+বৃ=দৈ+ দৈ+(ত × হ)।
=দৈর্ঘ্য × (১+হ × ত)। (১১নং, ১২নং ও ১৩নং চিত্র)।

তাপ যোগে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, ব্যবহার্য্য যন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত বিচারে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিহার নির্ণয় করা যাইতে পারে। "ক খ" দণ্ডটী ত° সেঃ মাত্রা উত্তাপবৃদ্ধি ফলে 'খ' হইতে 'চ' পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। "গ ঘ ঙ" চিহ্নিত নির্দ্দেশ-দণ্ডটী "গ" বিন্দুতে আবদ্ধ ও "ঘ" বিন্দুতে "ক খ" চিহ্নিত দণ্ডটীকে সমকোণাকৃতিতে স্পর্শ করিয়া আছে। সুতরাং দণ্ডটী 'চ' বিন্দু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে নির্দ্দেশক "গ চ ছ" অনুক্রমে অবস্থান করিবে। "ঘ ছ" চিহ্নিত স্থানে কোন পরিমাপক যন্ত্র সংলগ্ন হইলে "ঘ গ ছ" কোণ (=θ) নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক্ষেত্রে "গ চ"=দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি।

চিত্র হইতে প্রাপ্তব্য $\frac{\text{ঘ চ}}{\text{ঘ গ}} = \text{টান্ } \theta$

$\therefore$ ঘ চ = ঘ গ × টান্ θ

এক ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধি অনুযায়ী

$= \frac{\text{ঘ চ}}{\text{ত}} = \frac{\text{ঘ গ}}{\text{ত}} \text{টান্ } \theta$

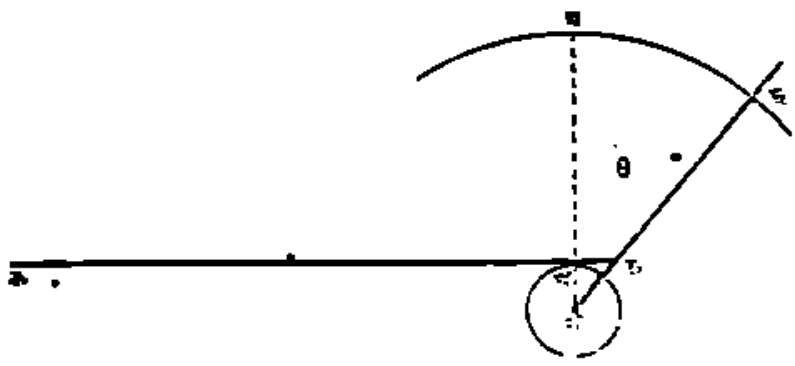

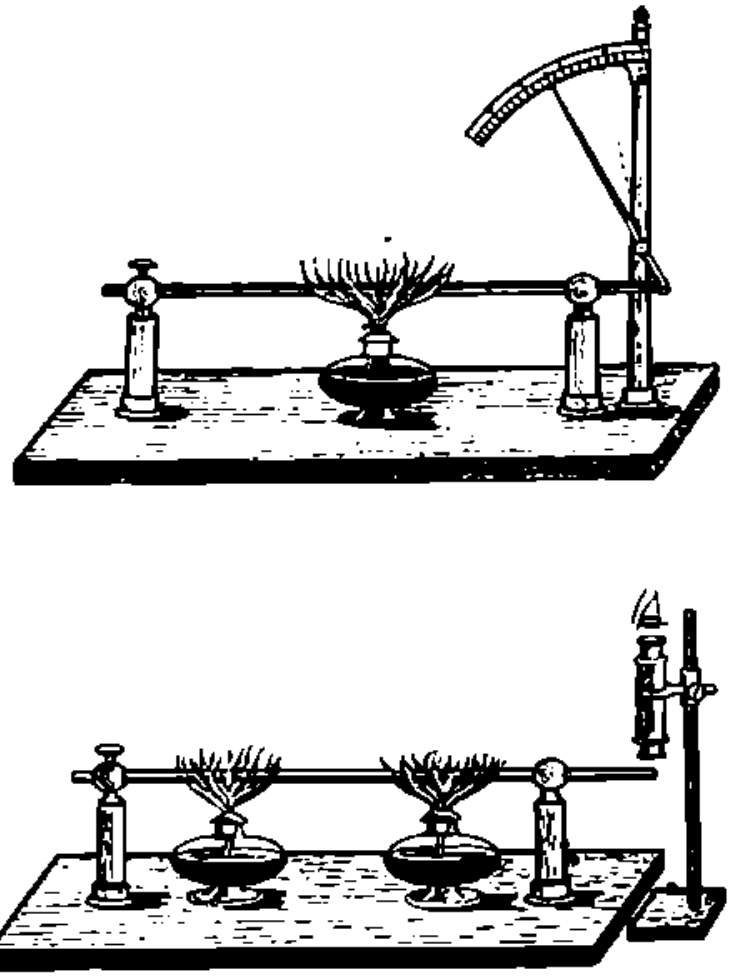

১৩নং চিত্র—দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি-হার নিরূপণ যন্ত্র। ২য়।

সুতরাং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিহার $= \frac{\text{প} \times \text{টান}\ \theta}{\text{ত} \times \text{ক}\ \text{প}}$

তাপজনিত দৈর্ঘ্য বিস্তার বাধা পাইলে প্রভূত বল উৎপন্ন হয়। একটী লৌহ দণ্ড 0° সেঃ হইতে ১০০° সেঃ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইলে উহা মূল দৈর্ঘ্যের ·০০১২ অংশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাধা পাইলে ইহা হইতে উৎপন্ন বলের পরিমাণ প্রতিবর্গ ইঞ্চি হইতে প্রায় ১২ টন (অর্থাৎ ৪০০ মণের) উপর ভারের সমান হইয়া থাকে। অনেক সময় পুলাদির প্রাচীর স্থানচ্যুত হইলে উক্ত বলের নিয়োগে উহা পুনরায় ঋজু করা হয় (১০নং চিত্র)। সম্মুখীন দুইটী প্রাচীর ছিদ্র করিয়া একটী লৌহদণ্ড উভয় ছিদ্রের ভিতর দিয়া চালিত হইয়া থাকে। প্রাচীরের বহির্ভাগে দণ্ডটীর প্রান্তে গঠিত ক্ষু সাহায্যে উহাকে প্রাচীরে দৃঢ় সংলগ্ন করা হয়। দণ্ডটীতে তাপ দিলে উহা বর্দ্ধিত হওয়ায় বহির্ভাগের ক্ষু প্রাচীর হইতে অপসৃত হইয়া থাকে। পুনরায় উহা দৃঢ়

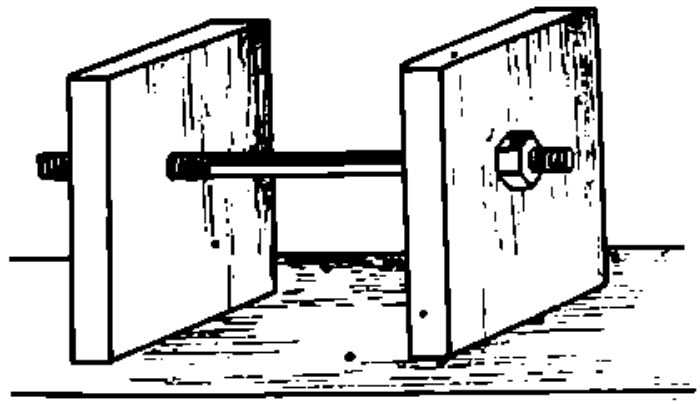

১৪নং চিত্র।

সংলগ্ন করিয়া দণ্ডটীকে শীতল হইতে দিলে সঙ্কোচনের সময় প্রাচীর দুইটী পরস্পর অভিমুখে বিপুল বলে আকর্ষিত হয়।

$$কা = ২\ \overline{l}\ \sqrt{\frac{ল}{ম}}$$

এক্ষেত্রে $\overline{l}$, ম, (বাল্যকৃষ্ণ-রেখা) প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট রাশি। সুতরাং ঘটিকা যন্ত্রাদিতে ব্যবহার্য্য দোলকের 'দোলন-কাল' উহার দৈর্ঘ্যের বর্গমূল অনুযায়ী। সেইজন্য শীতকালে যে দোলক যত্র প্রতি সেকেণ্ডে একটী দোলন সম্পন্ন করে, গ্রীষ্ম কালে দৈর্ঘ্য বর্দ্ধিত হওয়ায় একটী দোলন সম্পন্ন করিতে তাহার এক সেকেণ্ডের অধিক সময় প্রয়োজন হইবে। ক্ষুদ্র "পকেট ঘড়ি" প্রভৃতি একটি চক্রের বিভিন্নমুখী আবর্ত্তন অবলম্বনে সময় নিরূপণ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও উত্তাপের তারতম্যে চক্রটীর আবর্ত্তন কাল বিভিন্ন হইয়া যন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম ঘটে ফলে এই সকল যন্ত্র শীতকালে দ্রুতগামী ও গ্রীষ্মকালে মৃদুগামী হইয়া থাকে। অল্প মূল্যের ঘটিকা-ক্রেতা মাত্রেই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী।

১৫নং চিত্র। ইহার প্রস্তুতিকারের জন্য বিভিন্ন ধাতু একত্র করিয়া তাহা হইতে দোলক চক্র নির্দ্মিত হইয়া থাকে। চিত্রে প্রদর্শিত দোলকটীর গঠন আলোচনায় ইহা সুবোধ্য হইবে। চিত্রে মূল ও সূক্ষ্ম রেখায় দুইটী

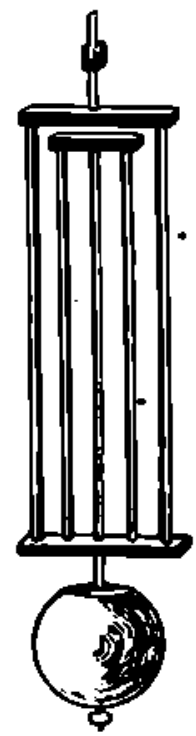

১৫নং চিত্র।

বিভিন্ন ধাতু ব্যক্ত হইয়াছে। মূল রেখানুযায়ী ধাতুটির দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিহার = "ক" ও সূক্ষ্ম রেখানুযায়ী ধাতুটির

"β" ধারা হইল। প্রথমোক্ত দণ্ডগুলির মোট দৈর্ঘ্য = ল, ও অপরগুলির মোট দৈর্ঘ্য = ল, ধারা হইল। মূল রেখা-যুক্ত দণ্ড সমষ্টি তাপযোগে ত° সেঃ উত্তাপ বৃদ্ধি লাভ করিলে উহা দৈর্ঘ্যে = ল, × ক × ত পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে। 'ক' বিন্দুতেও আবদ্ধ কল্পিত হইলে 'চ' চিহ্নিত অংশ উক্ত পরিমাণ নিম্নমুখে প্রসারিত হইবে। এইরূপে অপর দণ্ড সমষ্টি উপরোক্ত মাত্রা উত্তাপ বৃদ্ধি ফলে উর্দ্ধ মুখে ল, × β × ত পরিমাণ প্রসারিত হইবে। এই দুইটী প্রসারণের পরিমাণ সমান হইলে, সমগ্র যন্ত্রটী উর্দ্ধমুখে ও নিম্নমুখে সমান পরিমাণে বিস্তৃত হইবে। অর্থাৎ ক হইতে চ বিন্দুর অন্তর সমান থাকিবে। সুতরাং যন্ত্রটীর দোলনকাল ও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

$$ল_১ \times ক \times ত = ল_২ \times \beta \times ত$$

$$\text{বা } \frac{ল_১}{ল_২} = \frac{\beta}{ক}$$

ধাতু দুইটী পিত্তল ও লৌহ কল্পিত হইলে উভয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত = $\frac{০\cdot০০০১৮৭}{০\cdot০০০১১০} = \frac{১৮৭}{১১০} = ১\cdot৭$।

* উচ্চ শ্রেণীর সকল ঘড়িতেই এই উপায় অবলম্বন হইয়া থাকে।

তাপ যোগে কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রবিস্তার আলোচনায় দেখা যায়, মূল ক্ষেত্র পরিমাণ = ক, ও বর্দ্ধিত ক্ষেত্র পরিমাণ ক, ধারা হইলে, ক, = ক, × (১ + ২ × হা × ত)। 'হা' চিহ্নে দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি হার ও "ত" চিহ্নে উত্তাপ বৃদ্ধির মাত্রা ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষেত্রবৃদ্ধি হার, দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি-হারের দ্বিগুণ। আলোচনা সরল ও সংক্ষিপ্ত করার জন্য বিচার্য্য ক্ষেত্রটী সমচতুষ্কোণ-আকৃতি কল্পিত হইল। প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য = ল। ত° সেঃ মাত্রা উত্তাপ বৃদ্ধির পর বাহুর-দৈর্ঘ্য = ল × (১ + হা × ত)। প্রথমাবস্থার ক্ষেত্র-পরিমাণ = ল × ল = ল°। শেষে, ক্ষেত্র পরিমাণ = ল° × (১ + হা × ত)° = ল° × (১ + ২ × হা × ত + হা° × ত°)।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে "হা" পরিমাণ সর্ব্বক্ষেত্রেই অতি অল্প। সুতরাং হা°, হা° প্রভৃতি সংখ্যা অপরিমেয় সূক্ষ্ম। অতএব, কার্য্যতঃ ক্ষেত্রফল = ল° × (১ + ২ × হা × ত) অর্থাৎ ক, = ক, × (১ + ২ × হা × ত)।

(১৬নং চিত্র)। এইরূপ বস্তুটী একটী সমচতুষ্কোণ বেষ্টিত, সমবাহু অষ্টকীয় (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থতা বেধ = ল) কল্পনা করিলে উত্তাপানুরূপ চিহ্নানুক্রমে, বর্দ্ধিত আয়তন = ল° × (১ + ৩ × হা × ত + ৩ × হা° × ত° + হা° × ত°)। উল্লিখিত কারণে কার্য্যতঃ সংখ্যাটি = ল° × (১ + ৩ × হা × ত)। প্রথম আয়তন = আ, ও বর্দ্ধিত আয়তন = আ, কল্পিত হইলে আ, = আ, × (১ + ৩ × হা × ত)। অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধিহার, দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধিহারের তিন গুণ।

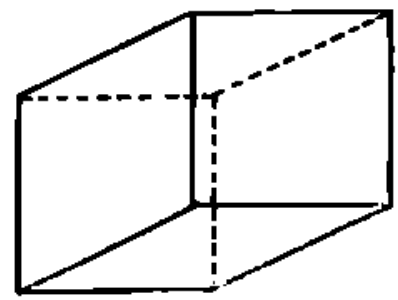

১৬নং চিত্র।

উপরোক্ত সঙ্কেতগুলি উত্তাপ বৃদ্ধি ফলে যে পরিমাণ সত্য, উত্তাপ হ্রাস হইলেও সেই পরিমাণে সত্য। এ ক্ষেত্রে "হা" পরিমাণ বিযুক্ত চিহ্নানুযায়ী হইবে। অর্থাৎ ল, = ল, × (১ − হা × ত), ক, = ক, × (১ − ২ × হা × ত) ইত্যাদি।

তরল ও বায়ব্য অবস্থায় অবশ্য আয়তন বিস্তারের আলোচনাই মাত্র সম্ভবপর। কঠিন অবস্থায় আয়তন

বিস্তারের পরিমাণ অপেক্ষা দ্রবের তরল অবস্থায় আয়তন বিস্তার অধিকতর। বায়বা দ্রবের আয়তন বিস্তার পরিমাণ অধিকতম। বায়ব্য অবস্থায় সকল দ্রব্যেরই আয়তন বিস্তার সমান। ইহার পরিমাণ= ১/২৭৩।

তাপ যোগে জলের আয়তন বৃদ্ধি বিচিত্র। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল 0° সেঃ হইতে ৪°সেঃ পর্য্যন্ত ক্রমে উত্তপ্ত হইলে দেখা যায় যে উহার আয়তন সঙ্কোচ ঘটিতে থাকে ও জলে গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ৪°সেঃ উত্তাপে উহার মাত্রা অধিকতম। ইহার উর্দ্ধে গুরুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। নিম্নে বর্ণিত "হোপ" সাহেবের আবিষ্কৃত পরীক্ষায় ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

(১৭নং চিত্র)। চিত্রানুযায়ী একটী জলপূর্ণ কাচপাত্রের মধ্যভাগে ধাতুনির্ম্মিত পাত্র সংলগ্ন হইয়াছে। ইহার উপরে ও নিম্নে, পাত্রটীর তলদেশে দুইটী তাপমান সজ্জিত আছে। ধাতুপাত্রটী বরফ-চূর্ণ দ্বারা পূর্ণ

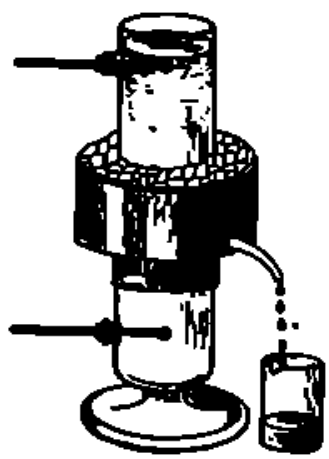

১৭নং চিত্র—"হোপের" পরীক্ষা।

করা হইলে কাচপাত্রের জল মধ্যভাগে শীতল হইতে থাকে। গুরুতর হওয়ায় শীতল জল পাত্রের নিম্নভাগে আগমন করে ও নিম্নস্থ তাপমানে উত্তাপ হ্রাস সূচিত হয়। এইরূপ উত্তাপ ক্রমশঃ ৪° সেঃ পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়া স্থির হয়। ইহার উপর উপরিস্থিত তাপমানে উত্তাপ হ্রাস নির্দ্দেশ করিতে থাকে ও 0 সেঃ উত্তাপে উপরিভাগের জল অল্প অল্প বরফে পরিণত হইতে আরম্ভ হয় ও বরফ, জল অপেক্ষা লঘুতর বলিয়া জলের উপরিভাগে ভাসমান হইয়া থাকে।

জলের এই বিশেষ ধর্ম্মের উপকারিতা বহুমুখী। মেরু সন্নিহিত প্রদেশে শীতকালে উত্তাপ অত্যন্ত নিম্ন হইয়া নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল বরফে পরিণত হয়। শীতল হইবার সময় ৪° সেঃ উত্তাপান্তর্গত জল নিম্নে অবস্থান করে এবং শীতলতর জল ও বরফ ইহার উপরিভাগে ভাসমান হয়। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় জল উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ গুরুতর হইলে, 0° সেঃ অন্তর্গত জল নিম্নে অবস্থান করিত। উপরিস্থ জল এইরূপে ক্রমাগত শীতল হইয়া সমগ্র জলাশয় বরফে পরিণত হইত ও জলচর সকল জীব একেবারে বিনষ্ট হইত।

জলের উল্লিখিত বিশেষ ধর্ম্মের জন্য জলাশয়াদির নিম্নভাগের জল ৪° সেঃ উত্তাপ মাত্রায় স্থায়ী হয় এবং এই জন্য জলচর জীবজন্তুর আহার বিহার জীবনধারণ সম্ভব হইয়া থাকে।

তাপমান যন্ত্র নির্ম্মাণে, যন্ত্রে ব্যবহৃত দ্রবাটীর তাপযোগে আয়তনবৃদ্ধি ধর্ম্ম, মূলতঃ অবলম্বন করা হয়। পারদ নির্ম্মিত যন্ত্র সাহায্যে—৩৯ সেঃ অপেক্ষা নিম্নতর উত্তাপ পরিমাণ করা সম্ভবপর নহে, কারণ পারদ—৩৯° সেঃ উত্তাপে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। উক্ত মাত্রা অপেক্ষা নিম্নতর উত্তাপ পরিমাপের জন্য যন্ত্রে সুরাসার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উচ্চদিকে ৩৬০ সেঃ উত্তাপে পারদ ফুটিতে আরম্ভ করে সুতরাং ৩৫০ সেঃ পর্য্যন্ত পারদযন্ত্রে পরিমিত হইতে পারে। উচ্চতর উত্তাপ পরিমাণের

জন্য নানারূপ মিশ্রধাতু নির্ম্মিত তাপমান প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে অগ্নিফুলিঙ্গের উত্তাপ (১২০০ —১৩০০° সেঃ পর্য্যন্ত। একটী লৌহদণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইতে পরিমিত হইত প্রায় সম্পূর্ণ লৌহ দণ্ডটী, একটী চিনামাটী নির্ম্মিত সিলিণ্ডারে আবদ্ধ থাকিত দণ্ডটীর অপর প্রান্তে নির্দ্দেশকটি সংলগ্ন করিয়া থাকিত। সিলিণ্ডারটি অগ্নিফুলিঙ্গের ভিতর চালিত হইলে লৌহ দণ্ডটী উত্তপ্ত হইয়া দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি বলে নির্দ্দেশকটিকে চালিত করিত। চালনের পরিমাণ হইতে উত্তাপ পরিমিত হইত।

উক্ত উপায়ে উত্তাপ পরিমাণ বহু সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া উহা এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। একণে ভড়িৎ-চুল্লি-বিশেষ অবলম্বনে এইরূপ উচ্চ উত্তাপ পরিমিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গান্তরে। ভড়িৎবিজ্ঞান ইহার বিশেষ আলোচনা হইবে।

তাপের তারতম্যে, একটি আবদ্ধ (এক প্রান্ত) স্ত্রীঃএর সঙ্কোচন বিস্তার অবলম্বনে প্রস্তুত তাপমান যন্ত্রও প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ পরিমাণের উদ্দেশ্যেই এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাকে অনায়াসে লইয়া ভ্রমণ করা সম্ভব বলিয়া ভ্রমণকারীর পক্ষে এইরূপ তাপমান যন্ত্র ব্যবহারই প্রশস্ত।

(১৮ ও ১৯ নং চিত্র) চিত্রানুযায়ী সূক্ষ্মছিদ্র নল-নলের নিম্নভাগে স্ত্রীঃসার ও তদুপরি কিছুদূর পর্য্যন্ত পারদপূর্ণ করা হয়। পারদ-স্তম্ভের পূর্ব্বে ও শেষে দুইটি লঘু লৌহদণ্ড, ক্ষুদ্র স্ত্রীঃ সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন গাত্রে সংলগ্ন থাকে। উত্তাপ হ্রাস হইতে থাকিলে পারদ-প্রান্ত আধারাভিমুখে অবতরণ করিবার সময়, নিম্নস্থ লৌহখণ্ডটিও তদনুসারে অপসৃত হইতে থাকে। পরে উত্তাপ বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে, পারদ-প্রান্ত লৌহ খণ্ডটিকে পরিত্যাগ করিয়া আধারের বিপরীত মুখে অগ্রসর হয়। অপর প্রান্তের লৌহখণ্ডটীও ইহার

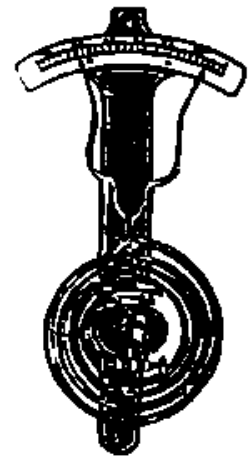

১৮নং চিত্র

স্ত্রীঃ তাপমান যন্ত্র।

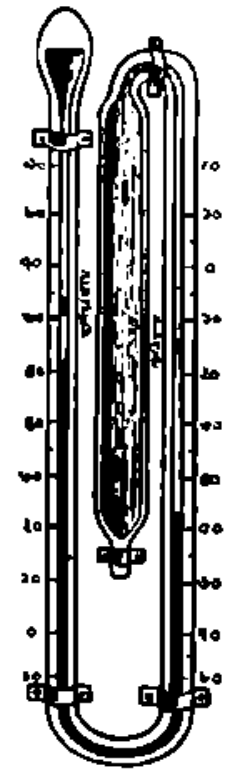

১৯নং চিত্র।

সহিত অগ্রসর হইতে থাকে এবং উচ্চতম উত্তাপ-অনুযায়ী স্থানে পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ এই যন্ত্র সাহায্যে যে কোন সময়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। একটি "চুম্বক" (পরে আলোচ্য) সাহায্যে লৌহখণ্ড দুইটি পারদপ্রান্তের সংস্পর্শে আনয়ন করা হয়।

আমাদের শারীরিক উত্তাপ পরিমাণের জন্য "দৈহিক তাপমান" যন্ত্রের নির্ম্মাণে আধারটির অল্পমাত্র দূরে ছিদ্রটী অতি সূক্ষ্ম ভাবে নির্ম্মিত হয়। ইহার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত পারদপ্রান্ত অগ্রসর হইয়া যথা-বিধি উত্তাপ প্রদর্শন করে; কিন্তু উত্তাপ হ্রাস হইলে-মাত্র অতি সূক্ষ্মছিদ্রের নিম্নস্থ পারদ আধারে অবতরণ

করিয়া উপরিস্থ পারদ-স্তম্ভ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং উপরিস্থ পারদ-প্রান্ত স্থির ভাবে পূর্ণ-উত্তাপ প্রদর্শন করিতে থাকে। এরূপ না হইলে দৈহিক উত্তাপ পরিমাণ সুকঠিন। রোগীর গাত্র হইতে অপসৃত হইবামাত্রই সাধারণ তাপমানের নির্দ্দেশ-রেখা নিম্নে অবতরণ করিতে থাকে। দৈহিক তাপমান বাঁকিয়া সূক্ষ্মছিদ্র পথের উভয় পার্শ্বস্থ পারদপ্রান্ত একত্র করা হয়। এক্ষণে ইহা পুনরায় ব্যবহার-উপযোগী হইল।

তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ-নির্দ্দেশ-ক্ষমতা, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ তারতম্যের ফলে যন্ত্রের নির্দ্দেশ-রেখার অপসরণ পরিমাণ যথা সম্ভব সূক্ষ্ম হইলেই উক্ত উদ্দেশ্য যে সাধিত হইবে, ইহা সহজ বোধ্য।

(২০নং চিত্র) উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের তাপমান যন্ত্র ব্যতীরেকেও এক প্রকার "ব্যবহৃত তাপমান" যন্ত্রের প্রচলন আছে। বায়ুর আয়তন বৃদ্ধিহার = ১/২৭৩ অর্থাৎ জলের আয়তন-বৃদ্ধিহারের প্রায় ১০ গুণ। সুতরাং বায়ুর আয়তন বৃদ্ধির অবলম্বনে নির্ম্মিত তাপমান যন্ত্রে অতি অল্প উত্তাপ-তারতম্য ও সূচিত ও পরিমিত হইয়া থাকে। এইরূপ যন্ত্রের গঠন, মূলতঃ পারদ-তাপমানেরই ন্যায়। আধারটী বৃহত্তর ও নলটী দীর্ঘতর মাত্র। আধারস্থ বায়ু, সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সন্নিবিষ্ট পারদ-স্তম্ভের সাহায্যে আবদ্ধ থাকে ও আয়তন-তারতম্যে পারদস্তম্ভটিকে নিকটে বা দূরে প্রেরণ করিয়া উত্তাপ-তারতম্য নির্দ্দেশ করে। অল্পমাত্র উত্তাপ তারতম্যে

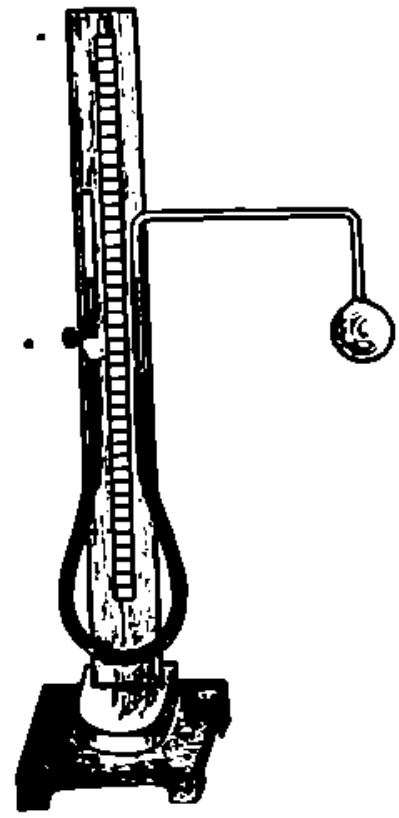

২০নং চিত্র—ব্যবহৃত-তাপমান যন্ত্র।

উক্তযন্ত্রের নির্দ্দেশ-রেখা সমধিক চালিত হওয়ার ফলে যন্ত্রটী অত্যল্প তারতম্য পরিমাণের জন্য বিশেষ উপযোগী হইলেও, অধিক তারতম্য পরিমাণের উপযোগী নহে।

কুতব্ মিনার

[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী]

ফেলরযাগ, দিল্লী

স্যাস-বাদশাহ কুতুবুদ্দিন (১২০৬-১২১১) ইহার গঠন কার্য্য আরম্ভ করেন, ও তাঁহার জামাতা আলতামাস্ ইহা সম্পূর্ণ করেন ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে যে সমস্ত ইমারতাদি তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের এক অপূর্ব্ব মিলন লক্ষিত হয়। কুতব্ মিনারেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। অষ্টোরলনি নমুমেণ্টের ন্যায় ইহার ভিতরেও ঘুরান সিঁড়ি আছে। ইহার প্রথম তিনতলার গঠন প্রণালীর মধ্যে বেশ একটী সুন্দর সামঞ্জস্য আছে এবং এই তিনতলা, আগাগোড়া সুন্দর রক্ত ও পীতবর্ণ বালু-প্রস্তরে তৈয়ারী। শুভ্র প্রস্তর নির্ম্মিত উপরের অংশের এই তিন তলার আদৌ সামঞ্জস্য নাই। সেই জন্য অনেকে অনুমান করেন যে উপরের অংশ পরে ফিরোজশার রাজত্ব কালে নির্ম্মিত হয়। প্রথম তিন তলার কার্ণীসের নীচে কোরাণ-উদ্ধৃত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ রমণীয় ভাবে পাথরে খোদিত আছে।

কুতব্ মিনার যে স্থানে অবস্থিত তাহারই অনতিদূরে এক উৎকৃষ্ট মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। সম্ভবতঃ কুতব মিনারের উপরে উঠিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুসলমান মোল্লা "আজান্" করিত, অর্থাৎ নমাজ পড়িবার জন্য সহরবাসী মুসলমানদিগকে আহ্বান করিত।

কুতব মিনারের চতুর্দ্দিকে হিন্দু নরপতিদিগের সৌধশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। ভারতের আর কোথাও হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের এত নিবিড় সম্মিলন দেখা যায় না।

কুতব মিনারের উচ্চতা ২৩৭ ফুট। ৩৭৮ টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া ইহার শিখরে আরোহণ করিলে, চারিদিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত দিল্লীর পুরাতন ও নূতন অট্টালিকা শ্রেণী, ও ইহার পাদমূলে যমুনার যে চিত্র মনের মধ্যে আঁকিয়া যায় তাহা সহজে মুছিবার নহে।

সম্পাদকীয়

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিরূপ স্বাভাবিক ও প্রবল এবং কিপ্রকারে বৈদেশিকগণের দ্বারা সেই ইচ্ছা প্রতিহত হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা প্রায় ১০ মাস পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত একটী মেয়েদের সভার কিয়দংশ মাত্র :—

ঐ সভায় মধ্যাহ্ন অধিবেশনে শিক্ষার বাহনের বিষয় আলোচনা করা হয়। শ্রীমতী টি, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী ও বেগম মুন্নাহজাদা সাকিনা ফরোজ সুলতানা এই তিন জনে তিনখানি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের পক্ষে বলেন।

ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা শ্রীমতী উড্‌থ্রেপ বলেন যে বিষয়টী বিশেষ গুরুতর ও একটী সভায় এ বিষয়ে মীমাংসা হইতে পারে না। এই বিষয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে বিশদভাবে তাহার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমতী এইচ্‌ বসু (প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা) বলেন যে বাংলাদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার সময় এখনও আসে নাই। কারণ বিভিন্ন বিষয়ের উপযোগী পুস্তক প্রস্তুত হয় নাই।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে কি ভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা অনবরত ব্যাহত হইতেছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই মাতৃস্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহার পূর্ব্বে যাঁহারা অজাত শিশুর প্রাণধারণের উপায় করিবার সম্বন্ধে চিন্তায় আকুল হন তাঁহাদের বিদ্যা যত বেশীই হউক না কেন বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির যে অভাব আছে তাহা বুঝিতে হইবে। অবশ্য এইরূপ একটী সহজ ও সরল বিষয় লইয়া এরূপ লিখিবার প্রয়োজন কিছুই ছিল না যদি না আমরা বুঝিতে পারিতাম যে আমাদের শিক্ষিত ও শিক্ষিতাগণের মধ্যে এই ধারণা এখন খুবই প্রবল যে বাংলা ভাষায় অনেক বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক নাই। অবশ্য রামায়ণ মহাভারতের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মাতৃভূমিতে কাব্য ও গদ্য সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে একথা কিয়ৎ পরিমাণে প্রযোজ্য হইলেও অনতিবিলম্বে সে অভাবের মোচন হইতে চলিয়াছে। কারণ আমরা আশা করি দেশবাসীর উপযুক্ত সহায়তা পাইলে ২।১ বৎসরের মধ্যেই বাংলাভাষায় বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক হইতে পরিণত জ্ঞান সম্বলিত পাঠ্য ও কার্য্যকারী পুস্তক দ্বারা বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দেওয়া যাইবে।

একবার সিন্ধুদেশের সক্কর নামক স্থানে আমরা কলিকাতার "বঙ্গবাসী" ও "রিপন" কলেজের ন্যায় একটী কলেজ স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি ও সেইজন্য কতিপয় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, যদিও তাঁহারা সকলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া একটী কলেজ পাইবার জন্য সরবরের কাগজে খুব ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন তাহা হইলেও যখন দেখিলেন যে সত্য সত্যই একটী কলেজ

প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইতেছে তখন দেশ 'ঘাবড়াইয়া' গেলেন। তার প্রধান কারণ এই যে যদি বেশী সংখ্যক লোক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মানের ক্ষতি হইবে।

অধিক সংখ্যক লোক শিক্ষিত হইলে তথাকথিত শিক্ষিতদের কৃত্রিম কদর ত কমিয়া যাবেই। তাহার উপর যদি আজ সর্ববিধ জ্ঞান আমরা মাতৃভাষায় লাভ করি তাহা হইলে তাঁহাদের যে কিরূপ অসুবিধা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ যে সব জ্ঞান লাভ করিতে তাঁহারা জীবনের প্রকৃষ্ট সময় (১২ বৎসর বয়স হইতে ২৩।২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) অতিবাহিত করিয়াছেন জনসাধারণ যদি মাতৃভাষায় ৪ বৎসরের মধ্যে সেই পরিমাণ বা ততোধিক জ্ঞানলাভ করেন তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর লোকের অসুবিধা হইলেও দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

এইরূপ ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ অগ্রগতির বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও আমার তাঁহাদের মধ্য হইতেই আমরা এমন কয়েকটী চিন্তাশীল ব্যক্তি পাইব যাঁহারা এ বিষয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। আর এখন হইতেছেও তাহাই। যিনি এখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি রচনা করিতেছেন তিনিও এইরূপ উচ্চ শিক্ষিতদের অন্যতম। আরও শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় এই যে যিনি ঐ পুস্তকগুলির চিত্রাদি অঙ্কন করিতেছেন তিনিও ঐ উচ্চ শিক্ষিতদের একজন। অতএব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মহিলা সভায় আমরা দেখিতে পাই যে বিদেশীয়গণ সঞ্চারিত মাতৃভাষাতত্ত্ব ও আত্মশক্তি বিশ্বাসহীনতা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে কয়েকজন সরকারী বেতনভোগী-দিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেও আমাদিগের দেশে শতকরা নব্বইজন অধিবাসী এক্ষণে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছেন বা খাঁটী মানুষই আছেন। সেজন্য আমরা বিশ্বাস করি, যে কার্য্যের জন্য আমরা দুই বৎসরের সময় পাইয়াছি দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে তাহা দুই মাসেই সম্পন্ন হইবে।

আজ আমরা পথের পাঠক পাঠিকাগণকে আমাদের দেশের গৌরব "প্রবাসী" পত্রিকায় কবিবর রবীন্দ্রনাথের যে অমূল্য লেখাগুলি বাহির হইতেছে সে গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার লেখার সবটী মুদ্রিত করিলে কোন রকম বাহুল্য দোষ ছিল না কারণ তিনি যে কথাগুলি তাহাতে বলিয়াছেন ও তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার যে উজ্জ্বল চিত্র তাঁর দেশবাসীর নিকট ধরিয়া দিয়াছেন সেগুলি সকল সময়েই তাঁদের আদর্শ হওয়া উচিত, আর তার প্রকৃত মূল্য তখনই আমরা দিতে পারিব যখন দেশ তাঁর সেই উপদেশগুলি ব্যাপকভাবে দেশের কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিবে। অনেক মূল্যবান মন্তব্যের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন সেটী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। "আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাক্ষেত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটে ফোঁটা দেখান না—গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার—বিশেষতঃ ফলিত-বিজ্ঞান। মনে করুন দিনা আমাদিগকে ইলেক্‌ট্রিসিটী ও জল দেবেন কথা আছে। এরই কলঘরের কাজে ছেলেদের হাত পাকাতে হবে। আমাদের ওখানে যে ছাপাখানা আছে তাতেও পালা করে ছেলেদের শিক্ষানবিশী করা উচিত।" তাছাড়া মোটরের কাজ শুধু গাড়ী চালানো নয়; ওর যন্ত্রতত্ত্ব। কলম ধরা ছাড়া আর বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাত দুটো থাকে আড়ষ্ট। সর্ব্বদা সকল নাড়া চাড়া করে এইটা ঘোচান চাই। সমবায়-প্রণালীতত্ত্ব ওদের প্রধান অঙ্গ করতে হবে; তার পরে শরীর বিজ্ঞান।"

* * * *

দেখিতে দেখিতে তুর্কীর সহিত চীনারাও

নিজেদের জীবনযাত্রা পাশ্চাত্য প্রণালীতে চালাইবার ষোল আনা ব্যবস্থাই করিয়া তুলিতেছে। সেই জন্য মনে হয় চীনারা আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়াও মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। অবশ্য যদি বাস্তবিক এই পরাজয় স্বীকারে জাতির প্রকৃত উপকার সাধিত হয় তাহা হইলে সেটা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে কিন্তু চীনের জনসাধারণ সে বিষয়ে বিবেচনা করিবার সুযোগ বা সুবিধা পাইয়াছেন কি? চিয়াং কাইসেকের বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করাটা হয়ত তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আজ ইংলণ্ড, আমেরিকা বা আফগানে এইরূপ একটা ব্যাপার সংঘটিত হইলে সেখানে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিত। তাহার কারণ তাহারা অনেক দিনের স্বাধীন জাতি—ইহাঁ স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়ে তাহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়া তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয় নাই। সম্প্রতি চীনারা নিজের প্রচলিত মাসের ও বৎসরের রীতি ত্যাগ করিয়া পুরা রকমে পাশ্চাত্যের মাস ও বৎসরের সময়ের রীতি অবলম্বন করিয়াছে। চীনাদের মাসের রীতি আমাদের জানা নাই তবে আমাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারা যায় যে আমাদের মাসের হিসাব খুবই বিজ্ঞান সম্মত ও আশা করি সুদূর ভবিষ্যতেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সহজ বা আধুনিক মাসের হিসাব আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে না। পাশ্চাত্য দেশের সহিত আমাদের মিসের হিসাবের কি প্রভেদ সে বিষয়ে আমরা রান্নাঘরে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

* * *

পবিত্র কাশীক্ষেত্রে নিখিল এশিয়ার শিক্ষা সম্মিলনের যে প্রথম অধিবেশন হইয়াছে তাহার বিবরণীর কিয়দংশ মাত্র দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকার ১৪ই পৌষ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়াই এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অধ্যাপক শেষাদ্রি ধর্ম্মশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনটী বিষয়ের উপরে বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন :—

(১) নারী-শিক্ষা—নারী-শিক্ষার অভাবে জাতির অর্দ্ধেক শক্তি যে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষার অত্যধিক তারতম্যে জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ হইতেছে এবং নানারূপ দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

(২) অবনত শ্রেণীর শিক্ষা—ভারতে এই নামের এক বিশাল মনুষ্য পরিবার আছে—ইহাই তো ভারত-বাসীদের পক্ষে বিষম লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। এবং এই "অস্পৃশ্য" "অনাচরণীয়" "অবনতদের" শিক্ষার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এবং আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা করি নাই, এবং এর চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর নাই। যতদিন এই সব "অস্পৃশ্য" ও "অবনতদের" জ্ঞানদানের ব্যবস্থা আমরা না করিতে পারিব, ততদিন জাতির পরাধীনতার মূলও উন্মোচিত হইবে না।

(৩) ব্যবহারিক শিক্ষা—তথাকথিত উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের যুবকেরা অক্ষম, অকর্ম্মণ্য, জীবন-সংগ্রামে অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহা-দিগকে জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষায় যোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হইবে। নতুবা প্রতীচ্যের সঙ্গে সমরণে আমরা দাঁড়াইতে পারিব না।

অধ্যাপক শেষাদ্রি বলিয়াছেন যে, এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, বহু অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় এই কার্য্য কেহ কেহ দুঃসাধ্যও মনে করিতে পারেন। কিন্তু অর্থই একমাত্র শক্তি নহে, অনেক স্থলেই তাহা শক্তির প্রতীকমাত্র। জাতি যদি ইচ্ছা করে, তবে অল্প

সমবের মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গীন জনশিক্ষার ব্যবস্থা উদ্ভাবন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াতে গিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যাপারের আমরা উল্লেখ করিতে পারি। মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা ব্যাপারে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে এই গণশিক্ষার আদর্শ রাশিয়ার নিকট হইতেই ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য-দেশকে গ্রহণ করিতে হইবে। রাশিয়া যে পদ্ধতিতে তাহাদিগের দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছে তাহা জগতের প্রত্যেক জাতির অনুকরণ-যোগ্য। তাহা যে পরিমাণে আমাদের দেশে প্রযোজ্য সেই পরিমাণে আমাদের গ্রহণ যোগ্য। দেশের জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিস্তারের জন্য আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়গণের একটী বিশেষ কর্ত্তব্য আছে সে কথা হয়ত তাঁহারা ভুলিয়া যাওয়াটা খুব সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু জাতির সর্ব্বাঙ্গীন অধোগতি তাঁহাদিগকে অতি নির্ম্মমভাবে এই কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্বরই স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, আমরা আশা করি তিনি ফিরিয়া আসিলে আমরা সকল বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইতে সক্ষম হইব।

• • • •

আমাদের দেশে বহুবিধ কলকারখানা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে বহু খ্যাতনামা চিন্তাশীল ব্যক্তি আপনাপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একটী কথা আমাদের বিচার করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে, দেশবাসীর আহারের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য অপরিহার্য্য। সুতরাং নানা দেশের ব্যবহার্য্য নানাবিধ বস্তুর বহন নির্ব্বাহের জন্য ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে কল কারখানা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠানও অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে আমাদের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্যের উৎপাদন সম্ভবপর। অতএব বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে।

যে অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিবার জন্য ইংলণ্ডে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্য অতি প্রয়োজনীয়, আমাদের দেশে চাষী অল্প পরিশ্রমেই তাহা দূর করিতে পারে। এজন্য তাহাকে এক মনে সাধ্যমত ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। ধান্য প্রভৃতি ফসলের যথার্থ মূল্য নির্ণয় উহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে হয় না; এবং উপযুক্ত মূল্য না পাইলে চাষী তাহার প্রয়োজনা-তিরিক্ত ফসল গোলাজাত করিয়া রাখিতে পারে।

কিন্তু পাটের ন্যায় চাষের উপকারিতা আমাদের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর মাত্র। কারণ পাট হইতে লাভের অতি সামান্য কণামাত্র চাষী বা আমাদের দেশবাসী পাইয়া থাকে।

চাষী পাট উৎপাদন করে, অর্থলাভের আশায়। গোলায় চাউল থাকিলে অন্নসংস্থান হইল। কিন্তু বস্ত্র ও বিলাস দ্রব্যাদি ক্রয়োপযোগী অর্থ সংস্থানের জন্য উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের বস্তুর উৎপাদন বাঞ্ছনীয়। এক কালে পাট এ উদ্দেশ্যের উপযোগী ছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার একমাত্র ক্রেতা, সংঘবদ্ধ বিদেশী; চাষীর লাভালাভের প্রতি উহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। উহাদের একমাত্র লক্ষ্য যথাসম্ভব অল্পমূল্যে পাট ক্রয়। উপযুক্ত মূল্যের প্রতীক্ষায় পাট গোলাজাত করা অসম্ভব। অতএব চাষী নিরুপায় ভাবে বিদেশী ক্রেতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে; এবং এই নিরুপায়, উদ্ভ-রোত্তর ফলপ্রসূ চাষীর পরিশ্রমের ফলে বিদেশী ব্যবসায়ী আজ ধনকুবের।

সুতরাং এক্ষণে চাউল প্রভৃতি ফসলের প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। এ জন্য চাষীকে সৎপরের

পরিশ্রম করিতে হয় না ও অবসর সময়ে কোনও বিক্রয়ের শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা সম্ভবপর এবং এই উপায়েই চাষীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অবসান হইবে। চরকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্রবয়ন, অবসর কালের উপযোগী একটী শিল্প। ইহাতে চাষীর বস্ত্র সংস্থান হইবে ও অতিরিক্ত বস্ত্র বা সূতা বিক্রয়ে কিছু অর্থ লাভও হইবে। এ জন্য প্রত্যেক চাষীরই কিছু কিছু কাপাসের চাষও করা কর্ত্তব্য। চাষীর উন্নতিতেই আমাদের দেশের সর্ব্বাঙ্গ উন্নতি হইবে।

আমাদের দেশে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা উক্তপ্রকার কুটীর-শিল্প পুনঃ প্রবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয়। কলকারখানার আবহাওয়ায় কর্ম্মীর মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয়; থাকে হস্তপদাদির কর্ম্মপটুতা। পাশ্চাত্য দেশে বহু মনীষী ইহা এক্ষণে উপলব্ধি করিয়াছেন ও তাহার নিরাকরণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমাদের এই সকল দেখিয়া সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

সকল দেশেই অল্পবিস্তর বস্ত্রাদি চালিত কারখানার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য। কিন্তু আমাদের দেশে এ সকল প্রতিষ্ঠানের বাহুল্য পরিত্যাজ্য। দেশের ব্যবহার্য্য সকল বস্ত্র উৎপাদন হইলেই আর কারখানার প্রসার অপ্রয়োজনীয়।

আরও একটী তথ্য আমাদের প্রচার করা কর্ত্তব্য। সেটী এই যে অর্থ সর্ব্বসময়ে বাঞ্ছনীয় নহে। এক গোলা ধান্য, উহা ক্রয়োপযোগী অর্থ অপেক্ষা বহুগুণে বাঞ্ছনীয়। বসত বাটী উহার অর্থমূল্য অপেক্ষা বহুগুণে আদরণীয়, পরিধেয় বস্ত্র ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ অপেক্ষা মূল্যবান। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে অর্থের ব্যবহার প্রসার লাভ করায় অর্থোপার্জ্জনই উপলক্ষ্য স্থলে মূল লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে এই অবস্থার উপলব্ধি আবশ্যক।

এ সকল প্রতীকারের উপায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তার এবং সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রণালী।

* * *

প্রায় একবৎসর অতীত হইল মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের সাহিত্য সৃষ্টি ও জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গীয় পূর্ত্ত-বিজ্ঞান পরিষদের জন্ম হয়। তখন জানিতাম না যে, যে কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহার ক্ষেত্র বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এইটি সচিত্র মাসিক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যে, তাহা এত শীঘ্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব তাহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। যাহা হউক কল্পনা যখন সত্যরূপ ধারণ করিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল তখন সেটি যতদূর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে কতকগুলি অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিয়া গেল তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি দেশবাসীগণের নিকট হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতি সংখ্যায় ইহার ক্রমোন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইব।

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় চলিত্রে বহুমান শাসনপ্রণালী পরিবর্তন করিয়া তাহার অভিমত প্রস্তাবোগে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল :—

রাশিয়ার মনস্তত্ত্বে আসা গেল। যা দেখটি অন্যত্র দেখতে। অন্য কোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এক সমান করে তাকিয়ে তুলছে। চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাহাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশী তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগসুবিধে, সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোন উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আরেক দল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাজের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না;—কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে ত মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে জন্মেছে। মানুষের সভ্যতার এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য খুব সুবিধার জন্য চেষ্টা করা উচিত। মুস্কিল এই, ধরা করে কোনো স্থায়ী ডিমিত করা চলেনা; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সভ্যতার সংগতিরক্ষা করা সম্ভব। যাই হোক আমি ভাল করে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে। ভেবে দেখ না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হচ্ছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড় হয়ে উঠে মানব সমাজে বড় কাজ করচে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের জন্যে একটা জাতিকে দারিদ্র্যে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায় কম পরে তাতে কি যায় আসে, তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত এমন কথা তাদের মনে আসে। কিন্তু একশো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

* * * *

আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার

পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ ত প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কি আশ্চর্য্য উদ্যমে সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায় তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্ম্মা হয়ে না থাকে এ জন্যে কি প্রচুর আয়োজন ও কি বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এসিয়ার অর্দ্ধ-সভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে—সাধ্যের শেষ ফসল পর্য্যন্ত যাতে তারা পায়, এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নাই; এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্ম্মীদের দলের। কোথাও এদের অসম্মান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্য্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের ত কথাই নেই—ইংলণ্ডে মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়।

• • •

হ্যারি টিবর্স এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে—তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অনুন্নত হতভাগা নিরুপায় ভারতবর্ষ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকাল মধ্যে রুষ্টবেশে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন। এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলিনে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্য একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সেটা হচ্ছে শিক্ষাবিধি নিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না সজীব মনের তত্ত্বর সঙ্গে বিস্তার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ চরে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যন্ত্রে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

• • •

শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা দেখানো না—গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার—বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞান। ম্যাডাম দিনা আমাদের ইলেক্‌ট্রিসিটি ও জল্‌ দেবেন কথা আছে, এরই কলঘরের কাজে ছেলেদের হাত পাকাতে হবে। আমাদের এখানে যে ছাপাখানা আছে তাতেও পালা করে ছেলেদের শিক্ষানবিশি করা উচিত, তা ছাড়া মোটরের কাজ শুধু গাড়ি চালানো নয়, ওর মধ্যে তত্ত্ব। কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাত দুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্ব্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে ঘোচানো চাই। সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করতে হইবে; তারপরে শরীর বিজ্ঞান। এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্ম্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা রকম ভদারকের দায়িত্ব নেয়, কর্ত্তৃত্ব সবই ওদের হাতে কেবল একজন পরিদর্শক থাকে।

• • • •

গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশী কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্য্যকর্ত্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয় অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর—ম্যালেরিয়ার জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য। এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়—মাপা গুণতি করে আমাদের দেশের কর্ম্মীদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা ঠিক নয় তারা পুরো একখানা মানুষ নয়.....

* * * *

রবীন্দ্র বাবুর বর্ণিত "সভ্যতার পিলসুজ" আমাদের দেশের চাষী। উহাদের উন্নতিই জাতীয় উন্নতির মূল। বিদেশী শাসকের হস্তে আমাদের চাষীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইয়া আসিতেছে। তাহার প্রধান কারণ শিক্ষাভাব। শিক্ষার অভাবেই চাষী অল্পস্থানে না করিয়া অল্প বিক্রয়ে অর্থসংস্থান করে। অর্থ, সামান্য বিলাস ব্যসনে অধিকাংশ বায় করিয়া কলগ্রস্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে চাষী পাটের ন্যায় অবশ্য বিক্রেয় বস্তু বহু পরিশ্রমে উৎপাদন করে; কিন্তু উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া কলগ্রস্ত হয়। শিক্ষার অভাবে চাষী বুঝিতে পারেনা যে অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের মূল্য বিক্রয়-প্রাপ্তব্য অর্থের দ্বারা নিরূপিত হয় না।

তাহার পর শিক্ষার বিধি। শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে প্রথমাবস্থাতেই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রুশিয়ায় অনুভূত হইয়াছে। তাহার কারণ, রুশিয়ার শাসক ও শাসিতের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। উভয়ে সহানুভূতি না থাকিলে প্রকৃত কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে না।

শেষে কবি বলিতেছেন যে, রুশিয়ার এই উন্নতির মূলে আছে ব্যবস্থাকর্তাদের কর্মক্ষমতা। শারীরিক বলের প্রয়োজনীয়তা বহুমুখী মাত্র, ভারবহনে বা আত্মরক্ষা বা ডাকাতীতে প্রযোজ্য নহে। আমাদের দেশে শিক্ষালী স্বাস্থ্যের বিনিময়ে "উচ্চ-শিক্ষা" লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ফলে অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা প্রকৃতই অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়েন সুতরাং শিক্ষার এই দিকে বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক।

আমার কথা—দশ বৎসর পূর্বে রুশিয়ার অবস্থা আমাদের মতই ছিল।

পত্রালাপ

বায়রা, পোঃ ঢাকা
২০।১১।৩০

মহাশয়,—

গত ১৮।১১।৩০ তারিখের ইং দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় (মঃ সঃ) আপনি ও পত্রিকা পক্ষীয় লোকের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া প্রাণে যুগপৎ আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। এজন্য আপনাকে শ্রদ্ধভক্তি নিবেদন উদ্দেশ্যে পত্রখানি লিখিতেছি। আপনার সময় অতি মূল্যবান জানি। তথাপি আপনার কথায় ও কার্য্যে যে মহান হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি—আশা করি এই পত্র পাঠে আপনার মূল্যবান সময় কতকটা নষ্ট করা হইলে নিজগুণে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আপনি ঠিকই বলিয়াছেন মানবশিশুকে মানুষ করিতে হইলে মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। প্রমুদ হস্তে যে জন্মগ্রহণ করেছে, সে নিশ্চয়ই বলবে মায়ের চাইতে শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র এ জগতে আর কেহ নাই। মানুষের জন্ম দৈব ঘটনা। চোখে দেখতে পাওয়া, কাণে শুনতে পারা, পায়ে চলতে পারা, কথা বলতে পারা প্রভৃতি সবই পরে করতে দিয়েছে বলে আমরা করতে পারি। মানুষের সমুদয় শক্তির বিকাশ বলিতে গেলে পরের

† প্রবাসী 'অগ্রহায়ণ' সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত

মনে সোদ্ধারী। তাই প্রত্যেকেরই মাতৃভাষা তার পক্ষে "দেবভাষা"।

শ্বাস ও প্রশ্বাসের মত ভাব ও ভাষা। যে ভাষা দেবদত্ত তাহাতেই কেবল সঠিক ভাবনা সম্ভব। ভাবিতে না শিখিলে কোন বিষয়ই প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। বিজাতীয় ভাষার বাহনে নানারূপের জ্ঞান লাভ একেবারে অসম্ভব; দুই একজন ব্যতিক্রম হইলেও উহা সত্য। একদা আমরা কয়েকটী যুবক—বলা বাহুল্য ইংরাজি শিক্ষিত—কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটী বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত করিলে, তিনি আমাদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন "তুম লোক্‌কা বিদ্যা হোতা হ্যায়, লেকিন বুদ্ধি নেহি হোতা"। মানুষকে বুদ্ধিজীবি বলে। বিজাতীয় ভাষায় অথবা যা মাতৃভাষা নয়, তাহাতে শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থায় মানুষ করার পক্ষে স্বতঃই বাঁধাত হয়। অথচ ইংরাজি ভাষা এতদ্দেশে শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য করা সম্পর্কে যে সব মামুলি যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে দেখা যায় তাহা নিতান্তই ভাবিয়া না দেখার ফল। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমান ভারতের যাহা কিছু দুঃখ, প্রধানতঃ ভাবনার অভাব হেতু সঞ্জাত। যে কয়টী অবশ্য সমাজে যাঁরা শ্রেষ্ঠপদবাচ্য তাঁদের—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এতদ্দেশে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে প্রতিকার করিতে হইলে আপনার মত লোকের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তাই আপনার কথায় ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি। ব্যবহারিক দিকে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার বাহন করার অপকারিতা ও ভা. জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অনাদর মায়েরই প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির অপলাপ ঘটায়। মনুষ্য জীবনে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।

আপনি ইহাও ঠিকই বলিয়াছেন, যে একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের এবং দশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হইবে। জনসমাজে যাহাতে উহা সহজে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য আপনারা যে "বঙ্গীয় পূর্ত্তবিজ্ঞান পরিষৎ" গঠন করিয়া আরাম স্বীকার করিতেছেন, তাহা নিতান্তই প্রশংসনীয়।

আমি নিজে বৈজ্ঞানিক বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহি। তথাপি বহুদিন হইতে আমাদের দেশে আপনাদের মত প্রতিষ্ঠান দেখিবার আশা হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ কাজের উপযুক্ত কাহাকেও প্রবৃদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আজ আপনাদের পরিষদের সন্ধান পাইয়া প্রাণে প্রাণে আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহ করিলে আমার আরও অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সে যাহা হোক, পত্রোত্তরে আপনাদের পরিষদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার নিয়মাবলী জানিতে পারিলে বাধিত হইব। অবশ্য বৈজ্ঞানিক বা উপাধিধারী না বলিয়া যদি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার পক্ষে বাধা হয়, তাহা হইলে আপনাদের অবৈতনিক দাসরূপে গ্রহণ করিলেও বাধিত হইব। ইতি

নিঃ
শ্রীনৃপেন্দ্র মোহন রায়

[২]

সাঁকুড়া

১৩২৭।১৭ই পৌষ।

শ্রীযুত সুনীল [redacted] চৌধুরী মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন ;

বঙ্গীয় পূর্ত-বিজ্ঞান-পরিষদের উদ্দেশ্য-পত্র-সহ আপনার ১৩ই পৌষের লিখিত পত্র পড়িয়াছি। উদ্দেশ্য মহৎ, তাহা সকলেই বলিবেন। যে দান-কর্ম দ্বারা লোকের (সাধারণের) অভাব পূরিত হয়, তাহাকে পূর্তকর্ম বলি। এই হেতু ইং public works অর্থে পূর্ত শব্দ চলিয়াছে। বোধ হয়, বঙ্গীয় পূর্ত বিজ্ঞান পরিষৎ সেইরূপ কর্মে উদ্‌যোগী হইয়াছেন, কৃষি ও বস্তুবিষয়েও চিন্তা করিবেন। ইহা অপেক্ষা পুণ্য কর্ম আর কি আছে। এই পরিষৎ স্কুল কলেজ খুলিবেন, মাসিক পুস্তকের "পল" দিয়া দেশের দৈন্য দূর করিবার পন্থা দেখাইবেন, এই সংবাদে আরও প্রীত হইলাম। লক্ষ্মী দেবী উদ্‌যোগী পুরুষসিংহকে বরণ করেন। কিন্তু বয়োধর্মে বিশ্বাস হইয়াছে, কাল প্রসন্ন না হইলে তিনি অনুকূল হন না। যাদবপুরের শিল্প-বিদ্যালয়কে কি কষ্টে কাজ করিতে হইয়াছে, তাহা স্মরণ হইতেছে। আশা করি পূর্ত-বিজ্ঞান-পরিষৎ কালের স্রোত অভীষ্ট পথে চালিত করিতে পারিবেন। আমি চক্ষুর দোষে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, আমার নিকট কোন সাহায্য পাইবার আশা করিবেন না।

বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তকের কল্পনা অনেকবার করা গিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়াছে। ইং ১৮৯৭ সালে বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীটের জি, সি, বোস কোম্পানী, মুদ্রাকর ও পুস্তক প্রকাশক, প্রথম কল্পনা করেন। তদনন্তর ইংরাজী ১৯০৩ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের শ্রীযুত হেমচন্দ্র মল্লিক "প্রবেশিকা প্রকাশ সমিতির" সম্পাদক হইয়া কয়েকজন বিজ্ঞকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর ইং ১৯১৪ সালে আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে উদ্‌যোগী হইতে অনুরোধ করি। আপনাদের কাছে আসিতে পারে ভাবিয়া আমার পত্রের অনুলিপি পাঠাইতেছি। তদনন্তর এক বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্য ধনবান মহোদয় দেশের অভাব মোচনে অগ্রসর হন। শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য অদ্যাপি কিছুই হইতে পারে নাই। এবার মনে হয়, পূর্ত-বিজ্ঞান-পরিষৎ কিছু করিতে পারিবেন। প্রকাশিত পুস্তক কে পড়িবে, কেন পড়িবে, এই দুই প্রশ্নের ঠিক উত্তর নির্ণীত হইলে "দুগ্ধান্তর" আনিতে পারে। ইতি

(অনুলিপি) [redacted]

ইং ১৬ই মার্চ্চ, ১৯১৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সমীপেষু,

আমার সবিনয় প্রার্থনা নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমীচীন বোধ হইলে তদনুযায়ী কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রস্তাব,—নিম্নলিখিত বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রচার।

১। বাণিজ্যে আবশ্যক ভূগোল বিবরণ।

২। আসিয়া খণ্ডের প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস।

৩। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস।

পাশ্চাত্য জাতির দর্শন।

প্রাচ্য জাতির দর্শন।

অঙ্কবিদ্যা।
ত্রিকোণমিতি ও বীজগণিত।
বহুবিদ্যা।
দৃগ্ জ্যোতিষ।
ক্ষিতিবিদ্যা।
প্রকৃতি বিদ্যা। *
উদ্ভিদ বিদ্যা।
প্রাণী বিদ্যা।
ভূবিদ্যা।

} মূর্ত্তবিদ্যা

প্রয়োজন—(১) দেশে জ্ঞান বিস্তার। এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালাতে পুস্তক নাই বিদ্যালয়ের পাঠ্য নহে বলিয়া অচিরে রচিত হইবার আশাও নাই। (২) পরিভাষা প্রচলন, তদ্দ্বারা জ্ঞান-বিস্তারে সাহায্য।

পুস্তকের আকার, বিষয়, প্রকাশ ব্যয়—প্রতি পুস্তক ২৫০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। বিষয় অনুসারে প্রায়ই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম খণ্ডে বিষয়ের মুখ, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ থাকিবে। ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোরম হইবে। ইংরেজী কিছুমাত্র থাকিবে না। দেশের যাহারা বাঙ্গালা কিংবা সংস্কৃত কিছু কিছু জানে, তাহারা বুঝিতে পারিবে। বালবোধের নিমিত্ত হইবে না. সমুদয় পুস্তকের বিচারণায় মানব-তত্ত্ব থাকিবে। অর্থাৎ আমাদের কাজে লাগার বিদ্যা শিখিতে হইবে। উহ, বিতর্ক, মতবাদ যথাসম্ভব ত্যক্ত হইবে। নূতন কিংবা লেখকের মৌলিক তত্ত্ব থাকিবে না। এ কারণ "সংহিতা-পঞ্চবিংশতি" এই নামে পুস্তক হইবে। দৃষ্টান্ত, ভূগোলবিবরণ,—দেশের গিরি, নদী, নগর প্রভৃতির নাম বৃথা থাকিবে না, এখন কোথায় কোন নদী বা গিরি বা নগর আছে নামৈরেখ কি ইতিহাসে লক্ষিত হইতেছে, কি কারণে কোন দেশের বিবরণ জানার আমাদের ও হিত হইতে পারে তাহা দেখাইতে হইবে। ইতিহাসে দর্শনেও এইরূপ। শুধু অমুক দেশে অমুক দর্শন না বলিয়া দর্শন হইতে মানবচরিত্র এই হইয়াছে, কিংবা মানব চরিত্রের দর্শনাংশ এই, তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। এইরূপ মূর্ত্তবিদ্যা। ক্ষিতি বিদ্যায় কতকগুলা মূল ও যৌগিক দ্রব্যের গুণ বর্ণনা নহে, প্রয়োগে মূর্ত্তাকারে এই বিদ্যা শিখাইতে হইবে। ইহাকে বৃথা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে অমূর্ত্ত অংশ আসিবে। আমার বিশ্বাস মানুষের অভাব আকাঙ্ক্ষাতন্ত্র করিয়া লিখিলে এই সকল বিদ্যার পুস্তক দেশের সাধারণ পাঠকের পঠনীয় হইবে। যে পরিভাষা লইয়া পরিষৎ বহু বৎসর যাবৎ চিন্তা করিতেছেন, তাহার প্রচলনের সুবিধা হইবে। পুস্তক লিখিবার সময় পরিভাষার দোষগুণ বুঝিতে পারা যায়, তালিকা দেখিলে পারা যায় না।

প্রতি খণ্ড পুস্তকের মূল্য ৫০ আনা ধার্য্য হইবে। ২৫ খণ্ড পুস্তক ছাপাইতে প্রতি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা হিসাবে প্রায় ৭০০০৲ টাকা লাগিবে। এই টাকা ভিক্ষা করিয়া উঠাইতে হইবে, কিংবা অন্য যে উপায় পরিষৎ সঙ্গত মনে করেন সে উপায় করিতে হইবে। পুস্তক বিক্রয় মূল্য হইতে ৸৹ আনা লেখক ও ।৹ আনা পরিষৎ পাইবেন। এই ।৹ আনা সভা হইতে বিজ্ঞাপনাদির ব্যয়, পরে নূতন সংস্করণ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

এই কার্য্যের নিমিত্ত সংহিতা-প্রচার-সমিতি হইবে। তাহার দশ জন সদস্যের মধ্যে একজন গ্রন্থ প্রকাশক একজন সংশোধক এবং বিষয় অনুসারে এক এক জন উপসংশোধক হইবেন।

* [এখন নাম ক্ষিতাম, ভূত বিদ্যা। বিজ্ঞান এক, বিদ্যা অনেক]

সমিতি লেখক নির্ব্বাচন করিবেন, কি ভাবে গ্রন্থ লিখিতে হইবে তাহা লেখককে বুঝাইয়া দিবেন। গ্রন্থ কিয়দংশ লেখা হইলে সমিতি পরীক্ষা করিবেন। সমাপ্ত হইলে প্রবন্ধে উপসংশোধক দেখিবেন, কোন অংশ কঠিন, জটিল বা অনাবশ্যক বোধ করিলে পরিবর্ত্তন ও বর্জ্জন করিবেন। শেষে সংশোধক ভাষা দেখিয়া দিলে পুস্তক মুদ্রিত হইবে। ইতি।—

বঙ্গীয় পূর্ত্ত-বিজ্ঞান পরিষৎ

উদ্দেশ্য

মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (পূর্ত্ত-শিল্প প্রভৃতি) শিক্ষা বিস্তার।

প্রণালী

ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসার আমাদের দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক এবং বর্ত্তমানে এই শিক্ষা লাভের পূর্ব্বেই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ অপরিহার্য্য বলিয়া এ সকল বিষয়ে শিক্ষার প্রসার এমন কি সাধারণ জ্ঞতা সহকারেও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সামান্য যাহা কিছু হইতেছে তাহা ভারতীয় প্রতিভার অনন্যসাধারণ জীবনী শক্তির ক্ষীণ বিকাশ মাত্র। যাহাতে আমাদের প্রতিভা আমাদের নিজের ভাষার মধ্য দিয়া তাহার সরল সহজ গতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সম্যক প্রকটিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই পরিষদ নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন :—

ক। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আধুনিক বিষয় সমূহ সম্বলিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

খ। পরিষদের তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র উপযুক্ত বিদ্যালয় ও কলেজ সমূহ পরিচালন এবং তাহাদের তত্ত্বাবধান করা অথবা সেই সকল স্থানে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানানুশীলনের ব্যবস্থা করা।

পুস্তক প্রভৃতি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সুবিধানুযায়ী পরিষদের নিজস্ব একটী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা।

গ। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়ে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটি সুগঠিত পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করা।

২। এই পরিষদ আধুনিক বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশের ও সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা ত করিবেনই, অধিকন্তু পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের যে সকল

অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চিত আছে তাহারও পুনরুদ্ধার কার্য্যে চেষ্টিত থাকিবেন।

পৃষ্ঠপোষক

৩। উক্ত উদ্দেশ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন মহোদয়গণ এককালীন ১০০০৲ (এক হাজার) অথবা তদূর্দ্ধ টাকা পরিষদে দান করিয়া এই পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হইতে পারিবেন।

(ক) যে সকল পুস্তক এই পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে তাহার প্রথম সংস্করণ কোন না কোন পৃষ্ঠপোষকের নামে প্রকাশ করা হইবে।

(খ) সাধারণ সভ্যের সকল প্রকার অধিকারের উপর পৃষ্ঠপোষকগণ এই বিশেষ অধিকার লাভ করিবেন যে এক এক বৎসর অন্তর প্রতি বৎসর তাঁহারা পরিষদের প্রতিষ্ঠিত অথবা পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহের যে কোন একটীতে একজন করিয়া ছাত্রকে অর্দ্ধ বেতনে প্রবেশাধিকার দিতে পারিবেন। অবশ্য মনোনীত বিদ্যার্থীর উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

বিশিষ্ট সভ্য

৪। যাঁহারা শিক্ষা কল্পে সবিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন অথবা শিক্ষা কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই পরিষদ বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া মনোনীত করিতে পারিবেন। মনোনীত হইলে ইঁহারা সাধারণ সভ্যের সকল অধিকার ভোগ করিবেন।

সাধারণ সভ্য

৫। (ক) পরিষদের একজন সভ্য বা পৃষ্ঠপোষকের প্রস্তাবানুসারে ইহার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন যে কোন ভদ্রমহোদয় নিম্নলিখিত যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া থাকিলে এই পরিষদ তাঁহাকে সাধারণ সভ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) সভ্য হইতে হইলে প্রথম বৎসর ৫০৲ এবং পর বৎসর হইতে প্রতি বৎসর ২০৲ হিসাবে চাঁদা দিতে হইবে।

(গ) যদি কোন সভ্য এককালীন ৩৫০৲ বা তদূর্দ্ধ টাকা প্রদান করেন তাহা হইলে তিনি জীবনব্যাপী সভ্য হইতে পারিবেন।

(ঘ) প্রত্যেক সভ্যকে নিম্নলিখিত উপাধি ব্যবহার করিবার অধিকার দিয়া একটী সনন্দ প্রদান করা হইবে।

পূর্ত্ত পরিষদ-সদস্য অর্থাৎ

M T.S. (Member of the Technical & Scientific Society.)

যোগ্যতা

(৵০) বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি, পূর্ত্ত-শিল্প, যন্ত্র-শিল্প তড়িৎ-শিল্প ও খনিজ-শিল্প বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষিত ব্যক্তিগণ, এবং যাঁহারা কোন না কোন বিষয়ে সবিশেষ কৃতিত্ব ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন কিংবা যাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে লোক সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন।

(৵০) যাঁহারা স্বীয় অধ্যবসায়, সততা ও কার্য্যদক্ষতার প্রভাবে জীবনের নিম্নতর স্তর হইতে উন্নীত হইয়াছেন ও আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার সমৃদ্ধি ও উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছেন।

(৵০) যাঁহারা ন্যূনকল্পে ৫ বৎসর পরিষদের সহায়ক সভ্য রহিয়াছেন।

পরিষদের সভ্যরূপে মনোনীত হইবার জন্য যথা-নির্দ্দিষ্ট আবেদন পত্র ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা পরিষদের কর্ম্মসচিবের নিকট প্রাপ্তব্য।

সহায়ক সভ্য

৬। (ক) যাঁহারা পরিষদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং নিম্নলিখিত যে কোন একটী যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা দুইজন সহায়ক সভ্য বা একজন সভ্যের বা পৃষ্ঠপোষকের প্রস্তাবানুসারে

সহায়ক সভ্য হইতে পারেন।

(খ) সহায়ক সভ্য হইলে প্রথম বৎসর ২৲ এবং পর বৎসর হইতে প্রতি বৎসর ১৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। ছাত্রগণের জন্য বিশেষ নিয়ম নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

(গ) সহায়ক সভ্য হইলে নিম্নলিখিত উপাধি ব্যবহার করিবার অধিকার দিয়া একটী সনন্দ প্রদান করা হইবে।

পূর্ত্ত-পরিষদ-সহায়ক অর্থাৎ
A.M.T.S. (Associate Member of the Technical and Scientific Society.)

যোগ্যতা।

তাঁহার বাংলাভাষায় অবিশেষ বুৎপত্তি আছে (তৎসম্বন্ধে পরিষদের সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া গণ্য হইবে)। কোন বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না থাকিলেও তাঁহাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করা যাইবে।

(ক) যাঁহারা বৈজ্ঞানিক কিংবা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

(খ) যাঁহারা কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অথবা সাধারণের কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

(গ) যাঁহারা কোনরূপ স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

(ঘ) যাঁহারা ভারতবর্ষের যে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অথবা এই পরিষদের প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্র।

ছাত্রগণের চাঁদা প্রচলিত চাঁদার অর্দ্ধেক ক৲ হইল। অর্থাৎ প্রথম বৎসর ১৲ ও তৎপরে বাৎসরিক ৩৲ চাঁদা দিয়া তাঁহারা সহায়ক সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন। ছাত্রজীবন শেষ হইলে তাঁহারা এ সুবিধা উপভোগ করিতে পারিবেন না। সহায়ক সভ্যের মনোনয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট পত্র ব্যবহার্য্য।

পরিষদ্ ; অংশ সভ্যের অনুমোদনানুসারে যে কোন ব্যক্তিকে এই পরিষদের সদস্য অথবা সহায়করূপে মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

সদস্য ও সহায়কগণের পুস্তিকা সমূহ

৮(ক) এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত বা তদ্দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে (যদি সেখানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে) সদস্য ও সহায়কগণের অনুমোদিত সুযোগ্য ছাত্রগণকে সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করা হইবে।

(খ) পরিষদের প্রকাশিত প্রতি পুস্তকের একখানি পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন। সেই পুস্তকের পরবর্ত্তী সংখ্যা শতকরা ১০৲ অল্পতর মূল্যে পাইবেন। সহায়কগণ প্রথম এক সংখ্যা অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন ও পরবর্ত্তী সংখ্যা শতকরা ১০৲ অল্পতর মূল্যে পাইবেন।

(গ) প্রত্যেক সদস্য ও সহায়ক পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ পাঠের সুবিধা পাইবেন।

কোন সদস্য বা সহায়ক বিজ্ঞাপিত দিবসের মধ্যে দুই বৎসরের চাঁদা যদি না দেন তাহা হইলে তাঁহার নাম পরিষদের তালিকা হইতে অপসারিত হইবে এবং পরিষদের প্রদত্ত উপাধি তিনি আর ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তদর্থে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত দিবসের মধ্যে তাঁহাকে সনন্দ ফিরাইয়া দিতে হইবে। যদি সাধারণ সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের মতে কোন বিশেষ সভ্যের উপস্থিতি পরিষদের কার্য্যের ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে উক্ত সভ্যকে এই পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

১০। অধিকাংশ সদস্য ও সহায়কগণের মতানুসারে বিধি ও উপবিধি সমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা

পরিচালক সভাগণ থাকিবেন ও প্রত্যেক সভাকে ঐ সকল বিধি মানিয়া চলিতে হইবে।

পৃষ্ঠপোষক পরিষদ ও সহায়ক পরিষদ সদস্যগণ কোন ব্যক্তিকে পরিষদ অথবা সহায়ক পরিষদ শ্রেণীভুক্ত করিবার নিমিত্ত সমর্থন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যথার্থ যোগ্যতার বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যাহাতে এই পরিষদ প্রদত্ত উপাধিগুলি প্রকৃত যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ হয় তাহার জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। সহায়ক পরিষদের উপাধি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি কোনরূপ বিদ্যালয় অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা পান নাই অথচ যাঁহাদিগের এরূপ প্রতিভা বা প্রকৃত যোগ্যতা আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা মাননীয় ও বিশিষ্ট কর্ম্মী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন তাঁহাদিগকে এই সভার পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়করূপে গ্রহণ করা।

১১। যে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ইংরাজী, সংস্কৃত বা অন্য যে কোন ভাষায় লিখিত পুস্তক আপত্তিজনক না হইলে পরিষদ সাদরে গ্রহণ করিবে। ঐরূপ প্রত্যেক পুস্তকে উপহার দাতার নাম ও ঠিকানা উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে। যাহারা এই পরিষদকে কোন পুস্তক উপহার দিতে ইচ্ছা করেন—তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা পরিষদের সভাপতি অথবা কর্ম্মসচিবের ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্য পদ্ধতি

১। এই পরিষদ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত পুস্তক প্রকাশ বিভাগের সহায়তায় কার্য্য করিবেন।

২। পুস্তক বিভাগ পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লেখকের পুস্তক মনোনয়ন ও অনুমোদন করিবেন। বলা বাহুল্য যে পুস্তক বিভাগের সভ্য মনোনয়নে পরিষদকে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে দেশের শ্রেষ্ঠ মনিষীগণ যেন মনোনীত হন, যাহাতে পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থসকল তত্তৎ বিষয়ে প্রমাণ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

৩। যদি কোন গ্রন্থকার কোন পুস্তক বিভাগের সভ্য না থাকেন তাহা হইলে ঐ বিভাগের সভ্যগণ তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

৪। যে সকল সভ্যগণ এই পরিষদের বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ ও প্রণয়ন বিভাগে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান

১। ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন, এম-এ, ডি-এস-সি (লণ্ডন), ডি-আই-সি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ব্যবহারিক রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক।

২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এস-সি; ভারত গভর্ণমেণ্টের ৪৩ বিভাগের রসায়নবিৎ।

৩। অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ, এম-এস-সি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

৪। শ্রীযুক্ত রঙ্গিনচন্দ্র মুন্সী, বি-এস-সি।

(খ) যন্ত্র ও তড়িৎ-শিল্প বিভাগ

১। ডক্টর যে এন বসু, ডি-ইঞ্জ (বার্লিন), এ-এম-এম-ই; যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেকানিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক

২। ডক্টর এস সি ভট্টাচার্য্য, এম-এস-সি, ডি-ইঞ্জ (বার্লিন), এ এম এম ই, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেকানিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক।

(গ) গণিত শাস্ত্র

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য কুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এস-সি।

২। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুন্সী, বি-এস-সি।

(ঘ) সাধারণ পূর্ত্ত শিল্প বিভাগ

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে, ডি-এস-সি (গ্লাসগো)।

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেন, এম-আই-এম-ই; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি-এস-সি, বি-ই, সি-ই, এ-এম-আই-ই।

শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার দত্ত, বি-ই, সি-ই, এ-এম-আই-ই, এম-এ-ই।

৪। শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল, সি-ই, এম-এ-ই।

(ঙ) কলা শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম-এ, ইন্ড-মি-এস; প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক।

২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন, এম-আই-এম-ই।

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, এম-আই-এম-এ।

(চ) ভারতীয় স্থপতি-শিল্প বিভাগ

শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এ-এম-এ-ই, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)

(ছ) পরামর্শকগণ

১। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট্।

২। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, এম-এস-সি।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশের নিমিত্ত এই পরিষদের নিকট প্রস্তুত আছে

অজৈব রসায়ন (Inorganic Chemistry)
জৈব রসায়ন (Organic Chemistry)
তাপ (Heat)
আলোক (Light)
শব্দ (Sound)
চুম্বক (Magnetism)
তড়িৎ (Electricity)
৮। যন্ত্র বিজ্ঞান (Mechanics)
৯। গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি (Domestic Sanitation)
১০। গৃহ নির্ম্মাণোপকরণ (Building Materials)
১১। গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী (Details of Construction)
১২। স্থাপত্য বিদ্যা (Architecture)
১৩। স্থিতি বিজ্ঞান (Statics)
১৪। গতি বিজ্ঞান (Dynamics)
১৫। পরিমিতি (Mensuration)
১৬। ত্রিকোনমিতি (Trigonometry)

পরিচালক মণ্ডলী

১। ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে, ডি-এস-সি, ইঞ্জিনিয়ারিং—(গ্লাসগো), এম-এ-ই, এম-আই-ই, পূর্ত্ত-পরিষদ সদস্য। কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ কর্ম্মচারী ও পূর্ত্তসচিব, সভাপতি।

২। ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন, এম-এ, ডি-এস-সি (লণ্ডন), ডি-আই-সি, পূর্ত্ত-পরিষদ-সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ব্যবহারিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক।

৩। ডক্টর যতীন্দ্রনাথ বসু, ডি-ইঞ্জ (বার্লিন), এ-এম-এম-ই, এ-এম-ই-ই, পূর্ত্ত-পরিষদ-সদস্য। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যন্ত্র-শিল্প অধ্যাপক, ১৬সি, কার্ণ রোড, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এস-সি, পূর্ত-পরিষদ্ সদস্য। ভারত গবর্ণমেণ্টের ৬ষ্ঠ বিভাগের রসায়নবিৎ। সহকারী-সভাপতি। ৩৭।১, বেনিয়া পুকুর লেন, ইটালী, কলিকাতা।

৫। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেন, এম-আই-এম-ই, পূর্ত-পরিষদ-সদস্য। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের' পূর্ত-শিল্প বিভাগের অধ্যাপক।

৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এ-এম-এ-ই, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), পূর্ত-পরিষদ-সদস্য, স্থাপত্য বিশারদ। ৪৯, মাণিক্য সেন, কলিকাতা।

৭। শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, এম-আই-এম-এ, পূর্ত-পরিষদ-সদস্য, কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ। কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ২৮।এ, রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিবেদন

এখনও অনেক শিক্ষিত মহোদয় বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানের বিদ্যা অর্জন করিতে হইলে বিদেশী ভাষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রবর্ত্তন না হইলে দেশের উন্নতির কোন আশাই নাই। পল্লীগ্রামে অনেক যুবকের গৃহে অন্ন আছে। আহারের জন্য তাহাদিগকে কাহারও মুখাপেক্ষী বা দাসত্ব স্বীকার করিতে হয় না। তাহাদের অবসরও যথেষ্ট আছে। কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার প্রতি তাহাদের একটী স্বভাব সুলভ বিতৃষ্ণা থাকায় তাহাদিগকে সত্বর বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। এই প্রগাঢ় বিতৃষ্ণাই তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার পরিচায়ক। অথচ ইহারই নিমিত্ত স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও তাহাদের নিকটাত্মীয়গণ সেই সুকুমার বালকগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। যদি মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও স্বহস্তে কার্য্য করিবার সুযোগ তাহাদিগকে দান করা যায় তাহা হইলে তাহারা নিজেদের জীবনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারে। দেশও তাহাদের নিকট হইতে প্রচুর জ্ঞান ও শিল্পসম্পদ লাভ করিতে পারে এ বিষয়ে আমরা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

আজকাল যে গ্রামের সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকই দেশকে অজ্ঞানান্ধকার ও দারিদ্র্যের কবলে ছাড়িয়া দিয়া সহরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন তাহার কারণ কি, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নবীনের রসসোল্লা ও স্বাস্থিক বা জীবনাগের সন্দেশ ব্যতীত সহরে কতকগুলি দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে যাহা এক্ষণে পল্লীগ্রামে পাওয়া অসম্ভব। বৈদ্যুতিক আলো, প্রচুর ও নির্ম্মল পানীয় জল, উৎকৃষ্ট যানবাহন, সুগঠিত পথ ঘাট, তাহাদের অন্যতম। কিন্তু যদি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদের জীবনীশক্তি বিপন্ন ও নিষ্পেষিত না হইয়া যাইত তাহা হইলে আমরা গ্রামে থাকিয়াই এই সমুদয় সুবিধার অধিকারী হইতে পারিতাম। জাপান দেশই ইহার উদাহরণ। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সুলভ করিতে হইলে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাতে দেশবাসীর মন হইতে সকল প্রকার কুসংস্কার বিদূরিত হইবে ও আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার সুবিধা ও ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিব। আমাদের মধ্যে (ইংরাজী) শিক্ষিতের ও অশিক্ষিতের এক বর্দ্ধমান ব্যবধান দূর হইয়া যাইবে।

যদিও এরূপ একটী অতিপ্রয়োজনীয় বৃহৎ কার্য্যের জন্য অল্প কোন সময় হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও সুফল লাভ করা সম্ভব হইত না, কিন্তু এক্ষণে কয়েকটী সুযোগ্য কর্ম্মীর সাহায্যে আমরা এই কার্য্য মাত্র ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা পাইলে

দুই বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব বলিয়াই আশা করি। এই অর্থ নিম্নলিখিত যে কোন রূপে সংগৃহীত হইতে পারে।

১ কোন সহৃদয় সম্রান্ত ও ধনাঢ্য রাজা বা জমিদার অথবা ব্যবসায়ী একেলাই এই অর্থ দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইতে পারেন।

২। ৮০০ জন প্রত্যেকে ৫০৲ টাকা দিতে পারেন

৩। বাংলার ৪০,০০০ গৃহস্থ একটী করিয়া টাকা দান করিলেও এই অর্থের সংস্থান হইতে পারে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে প্রত্যেক বাঙ্গালীই, তিনি যেখানেই অবস্থিত হউন না কেন এই অর্থ সংস্থানের সহায়তা করিবেন।

শ্রীযুক্ত সুনীল কৃষ্ণ রায়-চৌধুরী কর্ত্তৃক ২১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—"পুরাণ প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও ২৮এ, রাণী স্বর্ণময়ী ষ্ট্রীট—"পথ-কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত।

PARIS COLLAPSIBLE GATE CO.

Manufacturers of

COLLAPSIBLE WROUGHT IRON GATES AND GRILLES

:—"GATEGRILL" Telephone :—B. B. 3234.

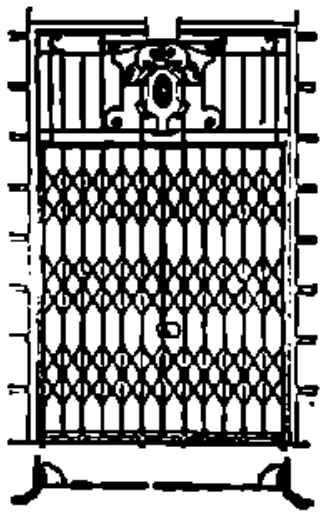

Collapsible gate with W. I. Grilles

Level Crossing Gates
Brass Hinges
Brass Tower & Sliding Bolts
Wrought fittings of Kinds
Hand Sack Trucks
Platform Trolleys
Perambulators & Baby Cars etc. etc.

I. Gates with Grilles

W. I. Railings

Managing Agents **D. G. Engineering Co.**

16/1A & 17 Beadon Street,

CALCUTTA.

কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

২৮এ, রাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীট

শ্যামবাজার, কলিকাতা।

ভারতবর্ষে এখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যুগ আসিয়াছে। উচ্চ বেতনে চাকুরী করিতে হইলে কিম্বা কোন রকম বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে কেবল মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিলেই তাহা সম্ভব হইতে পারে।

কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিম্নলিখিত বিভাগে অতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহু অর্থব্যয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে। ১। ওভারসিয়ার ২। সাব-ওভারসিয়ার ৩। ইলেক্ট্রীসিয়ানস্ ৪। ইলেক্ট্রীকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ৫। আর্কীটেকচার ৬। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য বিশেষ সার্ভে বিভাগ আছে।

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে নূতন পাঠ আরম্ভ হইবে। ম্যাট্রিক ও মন্ ম্যাট্রিক উভয়বিধ ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়। বিশেষ বিবরণের জন্য তিন আনার ডাক টিকিট সহ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখুন।

টেলিঃ—"অর্থ" কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩৮৭৮

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিমিটেড

৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারেণ্ট, সেভিংস্ ও ফিক্সড্ ডিপোজিটের টাকা জমা লওয়া হয়। সুদের হার, বিস্তৃত বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

এডুকেশন ডিপোজিট একাউণ্ট—মফঃস্বলের অভিভাবকগণ তাঁহাদের ছেলেদের কলিকাতায় লেখাপড়া প্রভৃতির খরচ দিবার জন্য খুলিতে পারেন। বিস্তৃত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠান হয়।

সেভিংস্ ডিপোজিট স্কীম—মাসিক ১০৲ টাকা হারে ৫ বৎসর জমা দেওয়া হইলে ৫ বৎসর অন্তে ৭৪০৲ টাকা এবং মাসিক ১০৲ টাকা হারে ১০ বৎসর জমা দেওয়া হইলে ১০ বৎসর অন্তে ১৬৫০৲ টাকা দেওয়া হয়। মাসিক কিস্তি বাদ পড়িলে টাকা বাহেয়াপ্ত করা হয় না।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্যাঙ্কের বিস্তৃত নিয়মাবলী পত্র লিখিলেই পাঠান হয়।